This book is part of the Carey Library and Research Centre at Serampore College.

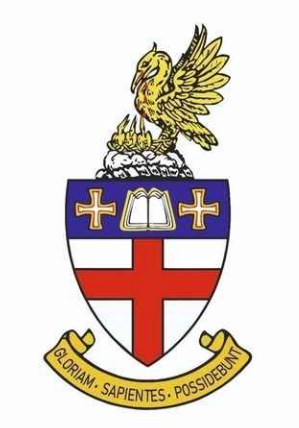

This is a reproduction of a library book that was digitized at the CLRC, Serampore.
The information in this book is freely available to the public and can be quoted with proper reference.

The use of this document may be subject to the Copyright Law of India or to site license or other rights management terms and conditions. The person using this document is liable for any infringement.

হরফশিল্পের পুরোধা

পঞ্চানন কর্মকার ও তাঁর পরিবার

সুনীল কুমার চট্টোপাধ্যায়

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] সাহিত্য মন্দির
[illegible]
১৩০৭

হরফশিল্পের পুরোধা

পঞ্চানন কর্মকার ও তাঁর পরিবার

সুনীল কুমার চট্টোপাধ্যায়

মহামায়া সাহিত্য মন্দির
শেওড়াফুলি
১৪০৭

প্রথম প্রকাশ □ ১৭ আগস্ট, ২০০০

প্রকাশক □ সমীর কুমার দে
সম্পাদক, মহামায়া সাহিত্য মন্দির
৬, চ্যাটার্জিপাড়া লেন
শেওড়াফুলি-৭১২২২৩, হুগলী

মুদ্রণ □ লেজারপ্লাস
২০, নোনাডাঙা রোড
শেওড়াফুলি, দূরভাষ : ৬৩২ ৫১৭৯

দাম □ পঞ্চাশ টাকা

পূজনীয়া দিদি
শ্রীমতী স্নেহলতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে
শ্রদ্ধার্ঘ

নিবেদন

অনভিজাত প্রতিভাশালী মনীষীরা আমাদের দেশে যথোচিত স্বীকৃতি ও সমাদর পায় নি। বিশেষ করে দেশীয় প্রযুক্তিবিদ শিল্পীদের সৃজনী প্রতিভাকে বরণ করতে আমাদের অনাগ্রহ সত্যই বিস্ময়কর। আঠারো উনিশ শতকের বহু দেশীয় প্রতিভার কথা ইতিহাসের পাতায় হারিয়ে গেছে। অনাদর ও অবহেলা সবচেয়ে বেশি পেয়েছেন বোধহয় ইংরেজ প্রাচ্যতত্ত্ববিদ ও মিশনারীদের শিক্ষাদাতা দরিদ্র পণ্ডিত এবং প্রযুক্তিবিদ হস্তশিল্পীরা। অথচ, এঁদেরই অবদানে বাংলা তথা ভারতের নবজাগরণের বনিয়াদ গড়ে উঠেছে। ইংরেজ রাজপুরুষদের অবজ্ঞায় ইতিহাসের পাতায় এঁরা স্থান পাননি। শুধু মিশনারীদের বিবরণীতে এঁদের কিছু কিছু কথা জানা যায়।

আমাদের দেশে সে সময়ে (১৮-১৯ শতকে) প্রযুক্তি বিজ্ঞানের যে বিস্ময়কর উন্নতি হয়েছিল তার ইতিহাস আমাদের অজানা এবং তার উপাদান সংগ্রহ করা আজ খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। ভারতে হরফ শিল্পের পুরোধা পঞ্চানন, মনোহর ও কৃষ্ণচন্দ্রের সম্বন্ধে খুব অল্পই আমরা জানি এবং তাও জেনেছি মিশনারী উৎস থেকে। এঁদের পূর্ণাঙ্গ জীবনী লেখার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করতে না পারার জন্য তা সম্ভব হয়নি। যা তথ্য পেয়েছি তাই দিয়ে এই ছোট বইটি রচনা করেছি। বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের কাছে এঁদের সৃজনী প্রতিভার পরিচয় যাতে পৌঁছায় তার চেষ্টা হয়েছে বইটিতে।

বাংলাদেশে মুদ্রণের সূচনা হয় ১৭৭৭-৭৮ সালে। ১৯৭৮ সালে আনন্দবাজার পত্রিকার নেতৃত্বে সাড়ম্বরে মুদ্রণের দু'শ বছর পূর্তি উৎসব পালিত হয়। ত্বরান্বিত হয় মুদ্রণের ক্রমোন্নতির ধারা। শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের দু'শ বছর পূর্ণ হয়েছে ২০০০ সালে। তবে, শ্রীরামপুর মিশনের যেমন অস্তিত্ব নেই, তেমনি নেই মিশন প্রেসেরও অস্তিত্ব। তাই মুদ্রণের ইতিহাসে মিশন প্রেসের কথা উল্লিখিত কিন্তু বিস্তৃতভাবে আলোচিত নয়।

উনিশ শতকের নবজাগরণের ঊষায় উইলিয়াম কেরীর নেতৃত্বে অনেক দেশীয় মনীষী উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গেছেন। কিন্তু কেরী, রামমোহন

প্রমুখ বিখ্যাত ব্যক্তিদের আড়ালে তা চলে যাওয়ায় তাঁদের সম্যক পরিচয় আমরা জানতে পারিনি। এদেশের মুদ্রণের ইতিহাসে হ্যালহেড্, উইলকিন্সের কথা বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে কিন্তু পঞ্চানন, মনোহরের নাম শুধু বলা হয়েছে, তাঁদের অবদান কোন মূল্যায়ন হয়নি। বিশেষ করে সে যুগের পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ হরফশিল্পী মনোহর ইতিহাসের পাতায় স্থান পান নি।

ইতিহাসের পাতায় হারিয়ে যাওয়া কয়েকটি প্রতিভার কথা এখানে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। শ্রম সার্থক হবে যদি বর্তমান প্রজন্মের মধ্যে এই সব উপেক্ষিত মনীষীদের সম্পর্কে কিছু আগ্রহ সঞ্চার করতে পারি।

বইটি তথ্যনিষ্ঠ করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছি, কিন্তু অনেক তথ্যই সংগ্রহ করতে পারিনি। তাই অনেক জায়গায় অনুমানের ওপর নির্ভর করতে হয়েছে। আশাকরি, সুধী সমাজের আগ্রহ বিষয়টীর অসম্পূর্ণতা দূর করতে ব্রতী হবে।

প্রায় সাত আট বছর আগে বইটির খসড়া তৈরি করি এবং তথ্যানুসন্ধানে অনেকেরই সহৃদয় সাহায্য পাই, তাঁদের সকলকেই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। তবে যাঁদের সদয় সাহায্য ও উৎসাহদানে বইটি লেখা সম্ভব হয়েছে তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে আছেন ডাঃ ইন্দিরা দাস, শ্রী প্রণব দেব, শ্রীমতী বহ্নিশিখা ঘটক, অধ্যাপক তপন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বিদ্যৎজনেরা। উপদেশদানে আমায় ঋণী করেছেন শ্রী চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁকে জানাই সশ্রদ্ধ প্রণাম। সর্বশ্রী বিমান মল্লিক, সুশীল কুমার বিশ্বাস, উমাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, গোবিন্দলাল দাস প্রভৃতি সুধীজনের অকৃপণ সহায়তার কথা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করি।

লেজারপ্লাসের শ্যামসুন্দর বেরা ও সহকর্মীরা অতি অল্প সময়ে সযত্নে বইটি ছেপেছেন, তাঁদেরকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

গ্রন্থে পরিবেশিত বক্তব্যের প্রতি সুধি সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারলে শ্রম সার্থক মনে করব।

১৭ আগস্ট, ২০০০
৬, চ্যাটার্জি পাড়া লেন
শেওড়াফুলি ৭১২২২৩

সুনীল কুমার চট্টোপাধ্যায়

সূচিপত্র

১. পটভূমি ও বংশ পরিচয় ১

২. বাংলাদেশে মুদ্রণ ও হরফ শিল্পের সূচনা ৫

৩. আঠারো শতকে কলকাতায় মুদ্রণ ও হরফ শিল্প ১২

৪. শ্রীরামপুর মিশনের মুদ্রণ প্রকল্পের পটভূমি ও সূচনা (১৭৯৩-১৮০০) ১৯

৫. শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের হরফ শিল্প ও তার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র—শ্রীরামপুরে পঞ্চানন (১৮০০-১৮০৪) ২৯

৬. শ্রীরামপুর হরফ শিল্পের উন্নতি ও প্রসার — মনোহর কর্মকারের প্রতিভার বিকাশ ৩৮

৭. শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে অগ্নিকাণ্ড ও তার প্রতিক্রিয়া (১৮১২) ৪৪

৮. মিশনের হরফ ও মুদ্রণ শিল্পের গৌরবময় অধ্যায় — মনোহরের কৃতিত্বপূর্ণ ভূমিকা ৫৫

৯. শ্রীরামপুর মুদ্রণ ও হরফ শিল্পের পরবর্তী অধ্যায় — কৃষ্ণচন্দ্রের অবদান ৬১

১০. বাংলার নবজাগরণের উন্মেষে মুদ্রণ ও হরফশিল্পের ভূমিকা ৭৩

পরিশিষ্ট

(ক) হরফশিল্পগুরু পঞ্চানন কর্মকারের বংশাবলী

(খ) পঞ্চানন, মনোহর ও কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনে উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী

(গ) পঞ্চাননের পিতৃভূমি প্রসঙ্গে

(ঘ) মনোহর কর্মকারের বংশধর

১

পটভূমি ও বংশ পরিচয়

ভারতে মুদ্রণ ও হরফ শিল্পের সূচনা হয় যেমন বিচিত্র পরিবেশে তেমনি এদের বিকাশের মন্থরতাও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। যদিও সচল ধাতুর হরফে মুদ্রণের প্রসার পৃথিবীতে দ্রুত হয়নি। জার্মানীতে প্রথম ছাপা শুরু হয় ১৪৫৬ সালে, ইতালিতে ১৪৬৫, সুইজারল্যান্ডে ১৪৬৮, ফ্রান্সে ১৪৭০, হল্যান্ডে ১৪৭৩, স্পেনে ১৪৭৪ এবং ইংলন্ডে আরও পরে ১৪৭৬ সালে। ভারতে পর্তুগীজরা মুদ্রণ যন্ত্র আনেন ১৫৫৬ সালে এবং ছাপা শুরু করেন ১৫৫৭ থেকে[১]। কিন্তু তার সঙ্গে এ দেশের কোন সম্পর্ক ছিল না। পর্তুগীজরা নিজেদের কাজের জন্য প্রেসটি এনেছিলেন। প্রথমে ছাপার কাজ শুরু হয় গোয়ায় তারপর প্রেস আসে কুইলনে। এখানে থেকে ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় ভাষার প্রথম বই তামিলে লিখিত ডক্‌ট্রিনা খৃষ্টীনা প্রকাশিত হয়। তবে এদেশ ও সমাজের সঙ্গে এ মুদ্রণের কোন যোগ ছিল না এবং ভারতীয় সমাজে মুদ্রণ কোন আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারেনি। অনেকে মনে করেন ছাপ দেওয়া বা ছাপা প্রাচীন ও মধ্যযুগে ভারতে অপরিচিত ছিল না এবং পুঁথি ছাপানোর প্রয়োজন অনুভূত হয়নি বলেই এদেশে বই ছাপা আগে চালু হয়নি। শিক্ষা ক্ষেত্রে পুঁথি এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে হস্তলিখিত দলিল পত্রাদির বিশেষ গুরুত্ব থাকায় বিদেশিরা এদেশ মুদ্রণযন্ত্র প্রচলন করার পরও ভারতীয়দের মধ্যে এই নতুনযন্ত্র বিশেষ ঔৎসুক্য সৃষ্টি করতে পারেনি। পুঁথি এবং দলিল অনুলিখনে কুশলী একটি

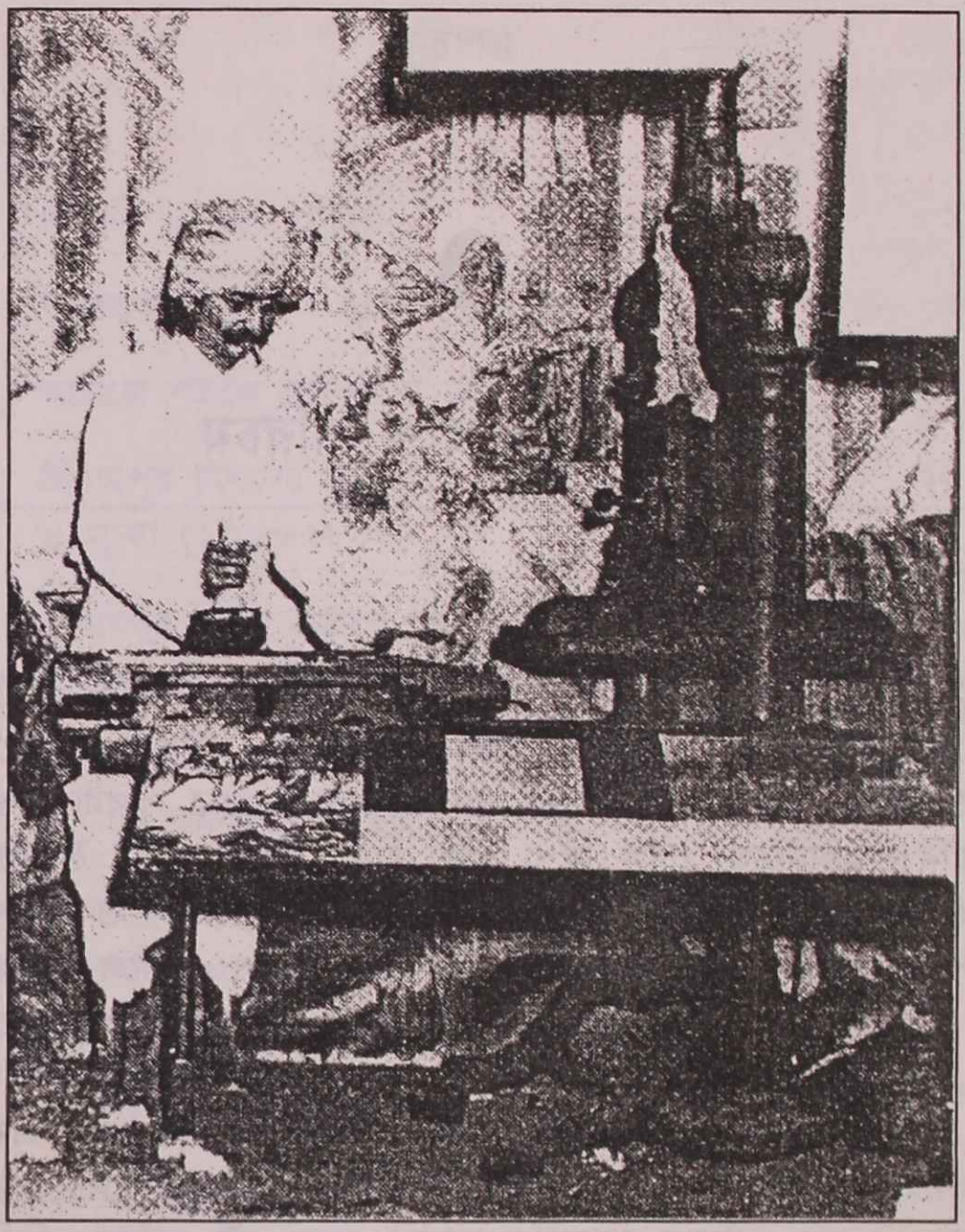

শ্রীরামপুর ছাপাখানায় কাজ চলছে (একটি মডেল)

বিশেষ সম্প্রদায় ভারতের সব অঞ্চলেই দক্ষতার সঙ্গে কাজ করত এবং প্রাথমিক অবস্থায় অনুলিপিকরেরা হয়ত মুদ্রণের বিরুদ্ধে প্রচারও করেছিল। প্রযুক্তিবিদ্যা ও যান্ত্রিক দক্ষতার অনুপস্থিতি নয়, আগ্রহের অভাবেই ভারতে মুদ্রণ শিল্প মন্তর গতিতে প্রসারিত হয়।

প্রযুক্তি বিদ্যা, বিজ্ঞান ভিত্তিক শিল্প সংগঠন এবং কারিগরী ও শৈল্পিক কুশলতায় প্রাকইংরেজ যুগের ভারত বিশেষ করে বাংলাদেশ অনগ্রসর ছিল এরূপ মনে করা যায় না। ইংরেজরা এদেশে রাজত্ব শুরু করার সময় পর্যন্ত অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশ কারিগরি

শিল্পে অনেক উন্নত ছিল এবং এই শিল্পজাত উৎকৃষ্ট দ্রব্য সংগ্রহের জন্যই পৃথিবীর বহু দেশের লোক সেই সময় বাংলাদেশে এসে ভিড় করে। ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জনৈক প্রতিনিধির মন্তব্য, ''But the demands for Bengal manufacturers can naver lessen in regard to their quality. It is so peculiar to that country that no nation on the globe can either equal or rival them.[২]

মুদ্রণ পূর্ব সময়ে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যার চর্চা যে অনুল্লেখযোগ্য নয় তা লেখকের 'বাংলায় বিজ্ঞানের পুঁথি' প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে।[৩] অবহেলা ও উপেক্ষায় বিনষ্ট হয়ে যাবার পর দেখা যায় এখনও ৮৩২টি বাংলা বিজ্ঞানের পুঁথি বিভিন্ন সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত আছে এবং এদের মধ্যে ৯টি কারিগরি বিদ্যার।[৪] প্রযুক্তি বিদ্যায় বাংলার যন্ত্রবিদ্‌রা যে কুশলী ছিলেন একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় এবং ধাতু শিল্পে বাংলার কর্মকার শ্রেণী গৌরবময় ঐতিহ্যের অধিকারী ছিল। প্রাচ্যভাষার হরফ শিল্পের পুরোধা পঞ্চানন কর্মকার, মনোহর কর্মকার ও কৃষ্ণচন্দ্র কর্মকার ঐতিহ্যের সেই ধারাকে উজ্জ্বলতম করে তোলেন ১৭৭৮ থেকে ১৮৫০-এর মধ্যে এবং এই প্রযুক্তি বিদ্যায় বাঙালির শ্রেষ্ঠত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর (১৭৭০) গ্রাম বাংলার প্রাণশক্তি শুষে নেয়। মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের 'Paradise of Nations' (বাংলাদেশ) পরিণত হয় শ্মশানে[৫]। ইংরেজ কোম্পানি আর নবাবীফৌজের অবাধ লুণ্ঠন আর অত্যাচারে বাংলার এক তৃতীয়াংশ গ্রাম জনশূন্য হয়। যারা বেঁচে থাকে তারা অর্ধমৃত হয়ে শুধু লাঞ্ছনা ভোগ করে। শিক্ষা, শিল্প, সংস্কৃতি, বাণিজ্য প্রভৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে গ্রামে আর কেউ থাকে না। কৃষির অবস্থা হয় শোচনীয়, অনাহার আর অর্ধাহারে দুর্বল কৃষিজীবীরা পারে না ভালো ফসল ফলাতে। প্রযুক্তিবিদ্, হস্তশিল্পী ও শ্রমজীবীরা কোন কাজ পায় না, বেঁচে থাকা তাদের দায় হয়ে পড়ে। জীবিকার সন্ধানে দলে দলে মানুষ গ্রাম ছেড়ে বন্দর ও নগরাঞ্চলে চলে আসে। গ্রামের দুর্গতি বেড়ে যায়। শিক্ষা, শিল্প, কৃষি প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রেই বহু প্রতিভার হয় অকাল অবসান।

এই সময় গ্রাম ছেড়ে যাওয়া বহু শিল্পী পরিবারের সঙ্গে মনে হয় হুগলী জেলার জিরাট, বলাগড়ের কর্মকার (মল্লিক) পরিবারও ছিল।

হুগলী জেলার উত্তরাংশে অবস্থিত জিরাট এক সময় সমৃদ্ধ ও বর্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল। জিরাট হুগলী জেলার বলাগড় থানার অন্তর্গত একটি গ্রাম। ইহা কলকাতা থেকে ৬৫ কি.মি ও জেলা শহর চুঁচুড়া থেকে ২৫ কি.মি উত্তরে অবস্থিত। জিরাট নামের উৎপত্তি ফারসী শব্দ 'জিরায়ৎ' থেকে। জিরায়ৎ মানে চাষের ক্ষেত। ইহা পূর্বরেলের হাওড়া ডিভিসনের ব্যান্ডেল-কাটোয়া শাখায় অবস্থিত একটি স্টেশন। বর্তমানে জিরাট একটি ক্রমবর্ধমান ঘনবসতি অঞ্চল।[৬] গ্রামটি পূর্বে গঙ্গার ধারেই ছিল, নদীর প্রবাহের ধারা পূর্ব দিকে সরে যাওয়ায় জিরাট এখন গঙ্গার ধার থেকে বেশ দূরে সরে গেছে। এই গ্রামের পত্তন হয় আনুমানিক পাঁচশত বছর আগে। পরের কয়ক শত বছরে এর অনেক উন্নতি হয়। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, কুমোর, তাঁতী প্রভৃতি সব শ্রেণীর লোকের বাসে জিরাট জমজমাট হয়ে ওঠে। বহু মনীষী, শিল্পী ও প্রযুক্তিবিদ গ্রামটিকে গৌরবমণ্ডিত করেছেন। ইংরেজ কোম্পানি এদেশে আসার আগে গ্রামের নিস্তরঙ্গ জীবনে মানুষ সুখে শান্তিতে বাস করত। অভাব ও অনটনের সঙ্গে গ্রামের মানুষের পরিচয় ছিল অল্প। তীর্থভূমি ত্রিবেণী ও বাণিজ্য নগরী সপ্তগ্রাম বন্দর এখান থেকে খুব দূরে নয়, তাই বাইরের সঙ্গে বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ গ্রামজীবনের চাঞ্চল্যকে অব্যাহত রেখেছিল। এখানকার সুস্থির গ্রাম সমাজে আঘাত আসে পলাশী যুদ্ধের (১৭৫৭) পর। লণ্ডভণ্ড হয়ে যায় গ্রাম সমাজ। গ্রামবাসীর দুর্গতি বাড়তে বাড়তে চরম সীমায় পৌঁছায় ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের (১৭৭০) সময়। পেটের দায়েও প্রাণ বাঁচাতে অনেককে তাই গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে আসতে হয় জীবিকার সন্ধানে নগরাঞ্চলে।

পঞ্চাননের পরিবারও গ্রাম ছেড়ে বংশবাটিতে বসতি স্থাপন করে। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পর জীবিকার সন্ধানে এই পরিবার গ্রাম ছাড়ে বলে মনে করা হয়। আবার কেউ কেউ মনে করেন পৈত্রিক সম্পত্তি নিয়ে পারিবারিক বিরোধের ফলে পঞ্চাননের বাবা শম্ভুনাথকে জিরাট ছেড়ে বংশবাটিতে চলে আসতে হয়। আবার জিরাটেই যে তাঁদের আদি বাড়ি ছিল সে সম্পর্কে সঠিক তথ্য এখন কেউ দিতে পারেন না। বলা হয় জিরাটে যেখানে স্বনামধন্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতি-মন্দির তার কাছে চারাবাগানে পঞ্চাননদের পৈত্রিক ভিটা ছিল। কিন্তু, এখন তার কোন নিদর্শন দেখা যায় না। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পর পঞ্চাননরা যে বংশবাটিতে ছিলেন এ সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য সূত্র পাওয়া যায়। পঞ্চাননের

পিতা বংশবাটিতে কামারশালা তৈরি করে বসবাস শুরু করেন। পঞ্চাননের কর্মজীবনের সূচনা হয় এইখানেই।

এরূপ জানা যায় যে পঞ্চাননের পূর্বপুরুষেরা ছিলেন বিখ্যাত খোদাইকারক, ধাতু অলংকরণ শিল্পী ও লিপিকার।[৮] লোহা, পেতল, তামা প্রভৃতি ধাতুর ওপর খোদাই-এর দ্বারা অলংকরণ ও লিপিকরণের কাজ ছিল পঞ্চাননের পরিবারের বংশগত পেশা। সেকালে রাজামহারাজ, নবাববাদশা, জমিদার, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি প্রভৃতিরা অস্ত্রশস্ত্রে নামাংকরণ, তৈজসপত্রে অলংকরণ এবং দান পত্রাদিতে উৎকীর্ণকরণের জন্য বেতনভোগী খোদাই শিল্পী ও লিপিকর রাখতেন। তাছাড়া কর্মকারেরা স্বাধীনভাবে এইকাজ করতেন। পঞ্চাননের কোন পূর্বপুরুষ (অনুমান করা যায় পঞ্চাননের পিতামহ নিমাইচন্দ্র) বাংলার নবাব আলীবর্দির অধীনে খোদাই শিল্পী হিসাবে চাকুরী পান। শিল্পী হিসাবে তিনি সে যুগে নিশ্চয়ই সেরা ছিলেন এবং সেইজন্যই নবাবের অধীনে কাজ পান। নবার আলীবর্দি খোদাই শিল্পী নিমাই চন্দ্রের কাজে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে পারিতোষিক ও 'মল্লিক' উপাধি প্রদান করেন।[৯] নিমাই চন্দ্র গ্রামে ফিরে এসে পৈত্রিক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এই জিরাটেই পঞ্চানন জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁর বাল্য ও কৈশোরের দিনগুলি কাটে এখানেই। অনুমান করা যায় প্রাথমিক শিক্ষালাভের পর তিনি পিতা শম্ভুচন্দ্রের কাছ থেকে বংশগত পেশা ধাতুশিল্পের কাজ শেখেন। যেকোন কারণেই হোক, শম্ভুচন্দ্র পৈত্রিক ভিটে ছেড়ে বংশবাটিতে বাস শুরু করেন।

উল্লেখপঞ্জী

১। শ্রী পান্থ ঃ যখন ছাপাখানা এলো পৃঃ ৪
২। East India co : Essays on Bengal 1770
৩। চট্টোপাধ্যায় সুনীলকুমার ঃ বাংলায় বিজ্ঞানের পুঁথি—রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা ১৭ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা ১৩৮৬ পৃঃ ৩৫-৪০
৪। ভট্টাচার্য যতীন্দ্র মোহন ঃ বাংলা পুঁথির তালিকা সমন্বয়
৫। মুখোপাধ্যায় সুবোধকুমার ঃ প্রাকপলাশী বাংলা পৃ ৫
৬। মিত্র সুধীর কুমার ঃ হুগলী জেলার ইতিহাস ২য় খণ্ড পৃঃ ৯৭৭।
৭। চট্টোপাধ্যায় সবিতা ঃ বঙ্গভাষায় ইউরোপীয় লেখক পৃঃ ১৪১
৮। চট্টোপাধ্যায় সবিতা ঃ বঙ্গভাষায় ইউরোপীয় লেখক পৃঃ ১৪১
৯। চট্টোপাধ্যায় সবিতা ঃ বঙ্গভাষায় ইউরোপীয় লেখক পৃঃ ১৪১

২

বাংলাদেশে মুদ্রণ ও হরফ শিল্পের সূচনা

১৭৭৮ সালে বাংলাদেশে মুদ্রণ সুরু হয় বলে অনেকের বিশ্বাস। কিন্তু কোন কোন গবেষক দেখিয়েছেন এর আগে কলকাতায় মুদ্রণ শুরু হয়ে যায়। ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীর (লন্ডন) ডঃ গ্রাহাম শ তাঁর 'Calcutta Printing to 1800' বই-এ লিখেছেন ১৭৭৭ সালে কলকাতাতেই মুদ্রণের সূচনা হয়। তিনি মনে করেন ১৭৭৭ সালে জেমস্ আগষ্টাস হিকি ছাপাখানার সাহায্যে ভাগ্য ফেরাবার উদ্দেশে একটি প্রেস নিয়ে কলকাতায় আসেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে প্রেস চালু করার আগেই তাঁকে দেনার দায়ে জেলে যেতে হয়। উদ্যমী হিকি এতে দমে যান নি। জেল কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে তিনি জেলে বসেই ছাপার কাজ শুরু করেন এবং কোম্পানি সরকারকে অনুরোধ করেন ছাপার অর্ডার দেবার জন্য। জেলে বসে হিকি যে সব ছাপার কাজ করেন তার কোন নিদর্শন পাওয়া যায়নি, শুধু জানা যায়, 'A Callendar for the year of our Lord MDCCLXXVIII' নামক ১৭৭৮ সালের একটি পঞ্জিকা ছাপা হয়। যদিও পঞ্জিকাটিতে কোন তারিখ নেই, তবে, অনুমান করা যায় ১৭৭৮ সালের পঞ্জিকা নিশ্চয়ই ঐ বছরের আগে ছাপা হয়েছে।[১]

১৭৭৮ সালে বাংলা ভাষার প্রথম হরফ নির্মাণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয় চুঁচুড়ায়। সচল ধাতু হরফ নির্মাণের মধ্য দিয়ে এই বছর ভারতে আধুনিক শিল্পায়নের শুভ সূচনা হয়। আর এই শিল্পায়নের অন্যতম রূপকার বাঙালি প্রযুক্তিবিদ শিল্পী শ্রী পঞ্চানন কর্মকার (মল্লিক)। তবে বাংলা মুদ্রণ ও হরফ শিল্প প্রতিষ্ঠার প্রয়াস এর আগেই শুরু হয়। ভাগ্যান্বেষী ওলন্দাজ যুবক

উইলিয়াম বোল্টস্ কলকাতায় প্রেস স্থাপন করে ভাগ্য ফেরাবার চেষ্টা করেন ১৭৬৭ সালে। দেশ লুণ্ঠনে মত্ত কোম্পানি ও নবাবের কর্মচারীরা প্রেসকে জুজুর মত ভয় করত। পাছে তাদের দুষ্কর্ম প্রচার হয়ে যায় এই ভয়ে তারা বোল্টসের উদ্যোগে আতংকিত হয়ে ওঠে। বোল্টস তাঁর পরিকল্পনা সকলকে জানাবার জন্য ১৭৬৬ সালে কলকাতার কাউন্সিল হাউসের দরজায় ও অন্যান্য প্রকাশ্য স্থানে নোটিশ ঝুলিয়ে দিয়ে বলেন, "...he is ready to give best encouragement to any person or persons who are versed in the business of printing to manage a press, the types and utencils of which he can produce."[২] পরবর্তি পর্যায়ে বোল্টসের বাংলা হরফ নির্মাণের প্রয়াস থেকে বোঝা যায় যে মুদ্রণের সম্পর্কে আগ্রহ তিনি দেশীয় সমাজে বিস্তৃত করতে চেয়েছিলেন। ভারতে সার্বজনীন প্রয়োজনে মুদ্রণ প্রচলনের এইটিই প্রথম প্রয়াস বলা যায়, কারণ পূর্বে দক্ষিণ ভারতে যে মুদ্রণ প্রচলিত হয় তা মিশনারী গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু খুব দুঃখের বিষয় কোম্পানির লোভী কর্মচারীরা এই উদ্যোগের জন্য বোল্টসকে ভারত থেকে বিতাড়িত করে। মুদ্রণ প্রচলনের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। বোল্টস লণ্ডনে ফিরে গিয়েও বাংলা হরফ নির্মাণ ও মুদ্রণের প্রয়াস চালিয়ে যান। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "উইলিয়াম বোল্টস বিলাতে এক প্রস্থ বাংলা হরফ তৈরি করার চেষ্টা করেন, তবে বিফল হন।"[৩] মহম্মদ সিদ্দিক খান বলেছেন, "বাংলা হরফের জটিল ধাঁচের নমুনা তৈরি করার যোগ্যতা বোল্টসের ছিল না।"[৪] অথচ চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন "বোল্টসের ব্যর্থতা অক্ষম নক্সার জন্য নয়। অর্থাভাবের জন্য।"[৫] তবে একথাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না যে ইংরেজ যন্ত্রবিদদের সীমিত ক্ষমতার জন্য বোল্টস ব্যর্থ হয়েছিলেন, কারণ হ্যালহেড তাঁর ব্যাকরণের ভূমিকায় লিখেছেন, 'Mr. Bolts (who is supposed to be well versed in this language) attempted to fabricate a set of types for it (Bengali Language) with the assistance of the ablest artist in London... but he has failed."[৬]

বোল্টস যে কাজ লন্ডনের ablest artist কে দিয়ে করাতে পারেন নি উইলকিন্স সেই কাজই পঞ্চানন কর্মকারকে দিয়ে করাতে সক্ষম হন। পরোক্ষভাবে পঞ্চাননের কৃতিত্ব স্বীকার করা হয়েছে। বোল্টস এদেশে থেকে দেশীয় কারিগরের সাহায্যে যদি বাংলা হরফ তৈরি করার সুযোগ পেতেন

তাহলে হয়ত তাঁকে ব্যর্থ হতে হত না।

১৭৭৮ সালে সচল ধাতু হরফের সাহায্যে বাংলা মুদ্রণের যে সূচনা হয় তা প্রাচ্য তত্ত্ববিদ ইংরেজ মনীষী ওয়ারেন হেস্টিংস, ন্যাথনিয়েল হ্যালহেড ও চার্লস উইলকিন্স এবং দেশীয় প্রযুক্তিবিদ শিল্পী পঞ্চানন কর্মকারের সমবেত ও একনিষ্ঠ প্রচেষ্টার ফলে। চারজনই সমভাবে এই কৃতিত্বের জন্য বরণীয় ও স্মরণীয়। এই শিল্পের সূচনা পর্বের প্রস্তুতিতে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস ১৭৭২ সালে দ্বিতীয়বার ভারতে আসার পর। দ্বৈত শাসনের অবসান হলে কোম্পানি সরকার প্রশাসনের পুরো দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং হেস্টিংস প্রশাসন, আইন ও বিচার ব্যবস্থাকে সুবিন্যস্ত করার দিকে মন দেন। দেশে তখন প্রশাসনিক ও আইন ঘটিত ব্যবস্থাপনা ও বিচার ব্যবস্থা প্রচলিত হিন্দু ও মুসলমান রীতি নীতির দ্বারা পরিচালিত হত। ইংরেজ সিভিলিয়ানদের পক্ষে ঐগুলি অনুসরণ করে কাজ করা খুব শক্ত হয়। হেস্টিংস ফার্সী বিভাগের রাইটার হ্যালহেডকে নির্দেশ দেন প্রচলিত হিন্দু মুসলিম আইন ও ব্যবস্থাদির ইংরেজি অনুবাদ করতে। এই অনুবদ ১৭৭৬ সালে লন্ডনে প্রকাশিত হয়। হ্যালহেডের কাজে সন্তুষ্ট হয়ে গভর্নর জেনারেল তাঁকে ইংরেজি ভাষায় বাংলা ব্যাকরণ রচনা করার নির্দেশ দেন। হেস্টিংস বুঝেছিলেন বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে ইংরেজ রাজত্ব গড়ে উঠছে এবং কর্মচারীরা বাংলা ভাষা না জানলে সরকারি কাজে নানা অসুবিধায় পড়বে। এদের বাংলা শেখার জন্য বাংলা ব্যাকরণের প্রয়োজনীয়তা তিনি বিশেষভাবে অনুভব করেন। হেস্টিংসের এই চিন্তা বিশেষ তাৎপর্য ও গুরুত্বপূর্ণ, কারণ পরবর্তি পর্যায়ে বাংলা ভাষার বিকাশও প্রসারের শুভ সূচনা হয় হেস্টিংসের এই সিদ্ধান্তে। বাংলা ভাষার অনুরাগীরা হেস্টিংসের ওপর এজন্য বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

সরকারি অনুমোদন না থাকা সত্বেও হেস্টিংস কোম্পানির রাজত্বে প্রেস প্রতিষ্ঠায় বাধা দেননি এবং কোম্পানির নামে প্রেস ও হরফ নির্মাণ কেন্দ্র স্থাপনে সহায়তা করেন। তাঁরই জন্য এদেশে মধ্য যুগীয় শিল্প চেতনার সঙ্গে আধুনিক শিল্পায়নের সফল সংযুক্তি সম্ভব হয়।

কোম্পানির অপশাসনে বাংলার আর্থিক বিপর্যয় হলে দেশীয় পণ্ডিত সমাজ বিপন্ন হয়ে পড়ে। হেস্টিংস এঁদের কলকাতায় কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেন এবং কলকাতায় সাংস্কৃতিক পরিবেশ গড়ে ওঠার পথ প্রশস্ত করেন। মুদ্রণ শিল্পের সূচনার মাধ্যমে বাংলার যন্ত্রবিদ কারুশিল্পীরাও প্রতিভা

বিকাশের সুযোগ পান। হেস্টিংসের বাংলা ও বাঙালির প্রতি গভীর অনুরাগ তাঁর বিরোধী পক্ষেরও প্রশংসা অর্জন করে। ঐতিহাসিক মিল লিখেছেন, ''He was the first, or among the first of the servants of the Company, who attempted to acquire any language of the natives ...''[7]

আর হেস্টিংস নিজে লিখেছেন ''These Hindoos who form the substance of the population are pure in their affections, simple in their domestic habits, gentle in intercourse, expert in business, quick of perception, patient of inert labour, respectful to authority and grateful for benefits conferred upon them.''[8]

বাঙালির মনীষা, বাঙালির জাতীয় চরিত্রের মহত্ত্ব ও বাঙালির কর্মদক্ষতা সম্বন্ধে অভীজ্ঞ রাজ-পুরুষের এই স্বীকৃতি যেন আমরা মনে রাখি বাংলার আর্থ সামাজিক ইতিহাস পর্যালোচনা করার সময়।

প্রতিষ্ঠিত ভাষাতত্ত্ববিদ না হয়েও প্রাচ্যতত্ত্ববিদ ন্যাথানিয়েল হ্যালহেড প্রথম মুদ্রিত বাংলা ব্যাকরণের রচয়িতার সম্মান লাভ করেন। অন্যান্য ইংরাজ অভিজাত পরিবারের সন্তানদের মত ভাগ্য ফেরাবার উদ্দেশ্যে ১৭৭২ সালে তিনি কোম্পানির রাইটার হিসাবে বাংলায় আসেন। এদেশে আসার আগে তিনি ফার্সী ভাষা শিখে আসেন এবং ফার্সী অনুবাদকের পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু ব্যক্তিগত সুযোগ সুবিধা থাকা সত্ত্বেও তিনি ভাগ্য ফেরাবার কোন সুবিধা করতে পারেননি। ১৭৭৩ সালে তিনি তাঁর বন্ধু পারকে লেখেন ''ঐশ্বর্যমণ্ডিত বাংলাদেশ আজ সম্পূর্ণ ধংস হয়েছে, আমি আমার ইংলণ্ডে অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দিয়ে কিছুই করতে পারছিনা, আমার ফার্সী শেখা বৃথাই হয়েছে।''[৯] তিনি তখনও সংস্কৃত বা বাংলা শেখার চেষ্টা করেননি। শেষ পর্যন্ত হেস্টিংস তাঁকে বিপর্যস্ত অবস্থা থেকে বাঁচান। দেশীয় আইন সমূহকে ফার্সী থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করার দায়িত্ব তাঁকে দেওয়া হয়। পণ্ডিতরা হিন্দু আইন সংস্কৃত থেকে ফার্সী অনুবাদ করেন এবং তিনি অনুবাদ করেন ফার্সী থেকে ইংরেজিতে। ১৭৭৬ সালে এই অনুবাদটি Code of Gentoo Laws নামে লন্ডনে মুদ্রিত হয়। হেস্টিংস অনুবাদের উচ্ছসিত প্রশংসা করেন। তিনি হয়ত হ্যালহেডের সঙ্গে পণ্ডিতদেরও প্রশংসা করেছিলেন। কিন্তু, তাঁদের ভাগ্যে সল্প পারিশ্রমিক ছাড়া আর কিছুই জোটে নি। জেন্টুস্‌লজে হ্যালহেড বাংলাকে modern

'jargon of Bengal' বলে উল্লেখ করেছেন এবং তখনও তিনি বাংলা ভাষা শেখা শুরু করেননি। ডঃ কাইউমের মতে ১৭৭৪ এর পর তিনি বাংলা শেখা শুরু করেন, কিন্তু jargon ভাষার ব্যাকরণ রচনা করার ইচ্ছা বোধ হয় প্রথম দিকে তাঁর ছিল না। হেস্টিংসের নির্দেশই তিনি বাংলা গ্রামার রচনায় মন দেন আর্থিক অনুদান লাভের আশ্বাস পেয়ে। এই সময় থেকে তিনি বাংলা ভাষা শেখার ওপর জোর দেন। ১৭৭৪ সাল থেকে সুরু করে ১৭৭৭ এর মধ্যে (অর্থাৎ ২/৩ বছরের মধ্যে) একটি অজ্ঞাত বিদেশি ভাষাকে সম্পূর্ণ আয়ত্ব করে ব্যাকরণ রচনা করা (সামনে নিদর্শন না থাকা সত্বেও) সত্যই অসাধারণ ভাষাতাত্বিক ও বৈয়াকরণিক প্রতিভার পরিচয়। বাংলা গ্রামার রচনার পূর্বে এবং পরে হ্যালহেড এরূপ প্রতিভার কোন পরিচয় দেননি। স্বাভাবিকভাবে মনে হয় মুনশী ও পণ্ডিতদের কথা তিনি সম্পূর্ণভাবে গোপন করে গেছেন। মহম্মদ কাইউম অনুমান করেন, মুনশীরা প্রথমে বিষয়বস্তু, ফার্সীতে লিখে দেন এবং হ্যালহেড সেই ফার্সীর ইংরেজি অনুবাদ করেন।[১০] সে যুগে প্রাচ্যতত্ত্ববিদ বলে পরিচিত সকল বিদেশিই দেশীয় পণ্ডিত ও মুনশীদের কাছে ভাষা ও প্রাচ্যবিদ্যা শিক্ষালাভ করেন এবং পণ্ডিত ও মুনসীদের সাহায্যেই তাঁরা বিভিন্ন বিষয়ে রচনা লেখেন। কিন্তু দেশীয়দের ঋণ স্বীকার করার ঔদার্য কেউই প্রায় দেখাননি। হরফ শিল্পের পুরোধা পঞ্চানন কর্মকার কোম্পানির কাজ ছেড়ে না এলে তাঁর নাম আমরা জানতে পারতুম না। যেমন জানতে পারিনি কোম্পানির সাহেবদের সহকারি অনেক প্রতিভাশালী পণ্ডিত, মুনশী, যন্ত্রবিদ শিল্পীদের নাম ও তাঁদের কৃতিত্বের কথা। মিশনারী উইলিয়াম কেরী তাঁর দিনলিপি, চিঠি পত্রাদি, কার্য বিবরণী প্রভৃতিতে পঞ্চানন কর্মকার, রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার প্রমুখ দেশীয় প্রতিভার কৃতিত্বের কথা উল্লেখ করেছেন। তাই এঁদের কথা জানবার সুযোগ আমরা পেয়েছি। তাছাড়া আমরা জেনেছি লেবেডফের মুনশী গোলক নাথ দাস, উইলকিন্সের পণ্ডিত কাশীনাথ, জোন্সের পণ্ডিত রামলোচন প্রভৃতির নাম।[১১] কিন্তু শিক্ষাগুরু হিসাবে যেমন এঁরা স্বীকৃতি পাননি, তেমনি এঁদের কৃতিত্বের পরিচয়ও আমাদের অজানা।

স্বনামধন্য বিশিষ্ট প্রাচ্যতত্ত্ববিদ চার্লস উইলকিন্স বাংলা মুদ্রণ ও হরফশিল্প সূচনার রূপকার বলে বন্দিত। ইংলন্ডের শ্রেষ্ঠ হরফ প্রস্তুত কারক যে বাংলা হরফ কর্তনে ব্যর্থ হন, উইলকিন্স সফল হন সেই কাজে। প্রাচ্যতত্বে অনুরাগী উইলকিন্সের মুদ্রণ শিল্পে প্রবেশ গভর্নর জেনারেল

ওয়ারেন হেস্টিংসের বিশেষ নির্দেশে। কোম্পানির প্রতিনিধিরূপে উইলকিন্স তখন চুঁচুড়ায় ছিলেন এবং হ্যালহেডের বই ছাপার জন্য পাওয়া যায় চুঁচুড়ায় এন্ড্রুজের প্রেস। এই কাজে ব্রতী হবার আগে মুদ্রণ বা ধাতু, লিপিকরণের কাজে তাঁর অনুরাগ বা অভিজ্ঞতা ছিল তেমন কোন তথ্য পাওয়া যায় না। হ্যালহেডের মত তিনিও ভাগ্যান্বেষণে রাইটারের চাকুরী নিয়ে ১৭৭০ সালে বাংলাদেশে আসেন এবং নিজের চেষ্টায় বাংলা, সংস্কৃত ও ফার্সী ভাষা শেখেন। প্রাচ্যতত্ত্বের প্রতি তাঁর অনুরাগ জন্মায় সহজাতভাবে।[১২] অর্থলাভের সম্ভাবনা থাকায় তিনি সাগ্রহে হ্যালহেডের বাংলা গ্রামার মুদ্রণ তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বাংলা হরফ তৈরি করার ব্যাপারে উইলকিন্স গভর্নর জেনারেল হেস্টিংসের কাছ থেকে বিশেষ অনুপ্রেরণা পান। তিনি চেয়েছিলেন স্বল্প ব্যয়ে এদেশেই বাংলা হরফ তৈরি করাতে। হরফ তৈরিতে সাহায্য করার জন্য অনুলিপিকর, যন্ত্রবিদ ও ধাতু লিপিকরণে দক্ষ শিল্পীর অনুসন্ধান করেন। এই অনুসন্ধানের সময় তিনি খবর পান পঞ্চাননের। পঞ্চানন তখন বাঁশবেড়ের জমিদার রাজা পুর্ণেন্দু রায়ের বাড়িতে ধাতব তৈজস পত্রাদিতে লিপিকরণের কাজ করতেন।[১৩] অনুমান করা যায় পঞ্চাননের কাজ দেখে উইলকিন্স সন্তুষ্ট হয়ে ছিলেন। এবং তাঁকে হরফ তৈরির কাজে নিযুক্ত করেন। একজন হস্তলিপিকরকে দিয়ে উইলকিন্স প্রথমে মুদ্রণের উপযোগী হরফের অনুলিপি তৈরি করে নেন এবং পরে পঞ্চাননকে বুঝিয়ে দেন পাঞ্চ, মেট্রিকস্ তৈরির ধারণা। হরফ ঢালাই ও খোদাই এর বিষয়টিও তিনি পঞ্চাননকে বুঝিয়ে দেন। পঞ্চানন উইলকিন্সের নির্দেশ মত কাজ শুরু করেন। কাজ চলন সই হরফ তৈরি করতে হয়ত তাঁদের অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা, অনেক সংশোধন সংযোজন করতে হয়েছিল। অবশেষে বাংলা হরফের একটি সম্পূর্ণ ফাউন্ট তৈরি করেন পঞ্চানন। সেই হরফ দিয়ে ছাপা হয় হ্যালহেডের বাংলা গ্রামার। বোল্টস্ ইংলন্ডের ablest artist কে দিয়ে যা করাতে ব্যর্থ হন, উইলকিন্স পঞ্চাননকে দিয়ে সেই কাজ সফল করেন।

হ্যালহেড বাংলা গ্রামারের ভূমিকায় হরফ তৈরি ও মুদ্রণের সমস্ত কৃতিত্ব উইলকিন্সের বলে উল্লেখ করেছেন। পরে ১৭৮৩ সালে জর্জ পেরীকে লিখিত পত্রে জানা যায় যে উইলকিন্স একজন অর্ধসভ্য মানুষের সহায়তায় বাংলা হরফের একটি সম্পূর্ণ ফাউন্ট তৈরি করেন। আবার বিশ্বকোষ ১৫ খণ্ডের ১৯৮ পাতায় মুদ্রাযন্ত্র নামক নিবন্ধে বলা হয়েছে প্রথম বাংলা হরফের সাট তৈরি করেন পঞ্চানন। এখন অনেক ঐতিহাসিকই

হ্যালহেডের উক্তিকে সত্য বলে মনে করেন না। উইলকিন্স ও পঞ্চানন উভয়ের যৌথ প্রয়াসে প্রথম বাংলা হরফ তৈরি হয় বলে তাঁদের বিশ্বাস। ১৮৩৪ সালে ক্যালকাটা ক্রীশ্চান অবসারভারে জশুয়া মার্শম্যান লেখেন, ''A native named Panchanan, of the caste of Smith, who had been instructed in cutting punches by Lieut. Wilkins, and had wrought at the same bench with him in cutting the Bengali fount of types.''[১৪]

যন্ত্রবিদ্যায় উলিকিন্সের পূর্ব শিক্ষা বা পারদর্শীতার কথা আমরা জানি না। তাই যন্ত্রবিদ পঞ্চাননকে তিনি হাতে নাতে শিখিয়েছিলেন একথা ঠিক বলা যায় না। বরং বলা যায় হরফ শিল্পের তাত্ত্বিক শিক্ষা তিনি পঞ্চাননকে দেন এবং তাঁর নির্দেশমত পঞ্চানন হরফ তৈরি করেন। প্রথম বাংলা হরফ তৈরির মাথা উইলকিন্স আর হাত পঞ্চানন।

উল্লেখ পঞ্জী

১. Shaw Dr. Graham : Printing in Calcutta to 1800 p.1
২. বন্দ্যোপাধ্যায় চিত্ররঞ্জন ঃ বোল্টসের বিচল হরফ, দুই শতকের বাংলার মুদ্রণ ও প্রকাশনে অন্তর্ভুত ঃ পৃ. ৩৬৭
৩. বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রজেন্দ্রনাথ ঃ সংবাদ পত্রে সেকালের কথা ২য় খণ্ড; পৃঃ ৭২৫
৪. সিদ্দিক খান মহম্মদ ঃ বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনের গোড়ার কথা, পৃঃ ২৭
৫. বন্দ্যোপাধ্যায় চিত্তরঞ্জন ঃ দুই শতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন। পৃঃ ৩৬৭
৬. Halhed N. B : Preface of a Grammar of the Bengali Language
৭. Mil : History of India (Oxford) p. 549
৮. Sinha N.K. : Economic History of Bengal II
৯. কাইউম মহম্মদ ঃ হ্যালহেডের পূর্ববঙ্গীয় মুনশী; ভাষাসাহিত্য পত্র, ৪র্থ বৎসর ১৩৮৩ পৃঃ ১৪৬
১০. কাইউম মহম্মদ ঃ হ্যালহেডের পূর্ববঙ্গীয় মুনশী; ভাষাসাহিত্য পত্র, ৪র্থ বৎসর ১৩৮৩ পৃঃ ১৪৮
১১. কাইউম মহম্মদ ঃ হ্যালহেডের পূর্ববঙ্গীয় মুনশী ঃ ভাষা সাহিত্য পত্র, ৪র্থ বৎসর ১৩৮৩ পৃঃ ১৪৮
১২. কাইউম মহম্মদ ঃ হ্যালহেডের পূর্ববঙ্গীয় মুনশী ; ভাষা সাহিত পত্র, ৪র্থ বৎসর ১৩৮৩ পৃঃ ১৪২-৪৩
১৩. চট্টোপাধ্যায় সবিতা ঃ বাংলা সাহিত্যে ইউরোপীয় লেখক পৃঃ ১৩৭
১৪. Calcutta Christian Observer, vol, III, 1834.

৩

আঠারো শতকে কলকাতায় মুদ্রণ ও হরফ শিল্প

উইলকিন্স পঞ্চাননের প্রতিভাকে অস্বীকার করতে পারেন নি। হ্যালহেডের গ্রামার মুদ্রণের সাফল্যে অনুপ্রাণিত উইলকিন্স কলকাতায় মুদ্রণ ও হরফ শিল্প প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হন। বাংলা মুদ্রণের সূচনায় চুঁচুড়ার প্রবেশ ও প্রস্থান নাটকীয়। হ্যালহেডের গ্রামার ছাপার আগে চুঁচুড়ার প্রেসের কথা কেউ জানত না এবং এর ছাপার পর চুঁচুড়া প্রেসের খবর আর কেউ পায়নি। অনুমান করা যায় বোল্টসের দুর্ভাগ্যের খবর জেনে এন্ড্রুজ কলকাতায় প্রেস চালাবার চেষ্টা না করে ওলন্দাজ কলোনী চুঁচুড়ায় আসেন, কিন্তু সুবিধা করতে না পেরে প্রেসের ব্যবসা ছেড়ে দেন।

ইতিমধ্যে কোম্পানির প্রেস ভীতি থাকা সত্বেও বাণিজ্যিক ও প্রশাসনিক কাজের সুবিধার জন্য ১৭৭৭-৭৮ সাল থেকে কলকাতায় ছাপার কাজ শুরু হয়ে যায়। কোম্পানির নিজের হাতে প্রেস রাখার যে প্রস্তাব উইলকিন্স দেন তা কর্তৃপক্ষের সুবিবেচনা লাভ করে। ১৭৭৮ এর ১৩ নভেম্বর, সরকারি কাগজ পত্রে দেখা যায় যে সরকারের দলিল পত্র ও অন্যান্য দরকারি কাগজপত্রাদি ছাপার জন্য প্রেস স্থাপনের একটি প্রস্তাব উইলকিন্স দিয়েছেন। ২২ ডিসেম্বর কোম্পানির পরিচালকমণ্ডলী উইলকিন্সের প্রস্তাব গ্রহণ করেন। অনুমান করা হয় এর পরই অর্থাৎ ১৭৭৯ সালে কলকাতায় কোম্পানির প্রেস প্রতিষ্ঠিত হয় এবং উইলকিন্স এর তত্বাবধানের দায়িত্ব পান।[১] যথারীতি পঞ্চাননের নাম উল্লেখ না করলেও বোঝা যায় পঞ্চাননকে কলকাতায় আনিয়ে তিনি প্রেসের সঙ্গে

হরফ ঢালাই খানাও স্থাপন করেন। অনুমান করা যায় দীর্ঘ কুড়ি বছর পঞ্চানন কলকাতায় হরফ তৈরি শিল্পের সঙ্গে যুক্ত থাকেন, কিন্তু হরফ শিল্পের উন্নতিতে তাঁর ভূমিকার কথা জানা যায় না। এই সময়ের মধ্যে (১৭৭৯-৯৯) কলকাতায় আরও কয়েকটি প্রেস ও হরফ-ঢালাই-খানা এবং মুদ্রাকররা নিম্ন তালিকানুযায়ী বই প্রকাশ করেন;[২]

প্রথম সারণী (১৭৭৮-১৭৯৯)

মুদ্রাকর	বই এর সংখ্যা
১. এ্যানুয়েল ক্যান্টো	১৪
২. যোশেফ কুপার	৫৭
৩. পল ফেরিস	২০
৪. গ্রীজ গর্ডন	১৭
৫. স্যামুয়েল গ্রীণওয়ে	৪
৬. জন হে	১৩
৭. জেমস্ হিকি	৫
৮. জন জনসন	১
৯. টমাস জোন্স	৩
১০. জে কিয়ারেন্ডার	৮
১১. জেমস্ লিবী	৬
১২. টি লিভিংস্টোন	১৬
১৩. উইলিয়াম ম্যাকে	২৩
১৪. বি. মেজিষ্ক	১
১৫. জন মিলার	১
১৬. এ পেরিয়া	১
১৭. জেমস্ স্যাকেল	৪
১৮. জে স্টিফেন	৩
১৯. স্টুয়ার্ড	২৯
২০. জেটমাস	৩
২১. টমসন	১৫
২২. আপজন	২৭
২৩. ভোগেল	৪

২৪.	ওয়াট্‌লে	৫
২৬.	উইলিয়ামস্‌	১১
২৭.	ই আই কোম্পানি	৫৮
		মোট: ৩৬৮

দ্বিতীয় সরণী ঃ ভাষা অনুযায়ী

ভাষা	সংখ্যা
ইংরাজী	২৩২
ফার্সী	৬৫
বাংলা	৩১
আরবী	১৬
হিন্দুস্থানী	১৩
অন্যান্য	১১
	মোট: ৩৬৮

কলকাতায় হরফ উৎপাদনের শিল্প চালু হলেও বাংলা ছাড়া অন্যান্য ভাষার হরফের বেশির ভাগ ইংলন্ড থেকে আনানো হয়। পঞ্চানন বাংলা হরফ তৈরি করা ছাড়া নাগরী হরফ তৈরি করার চেষ্টা করেন। কিন্তু মনে হয় তিনি কাজ করার সুযোগ, সুবিধা ও উৎসাহ কলকাতায় বিশেষ পাননি। তাই দেখা যায় যখন ভাগ্য ফেরাবার আশায় সকলে গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় চলে আসছে তখন পঞ্চানন কলকাতা ছেড়ে শ্রীরামপুরে গরীব মিশনারীদের কাছে কাজ করার জন্য যাচ্ছেন। ১৭৮৬ সালে উইলকিন্স ইংলন্ডে ফিরে যান। পঞ্চানন উইলকিন্সের অধীনে কাজ করেন এবং উইলকিন্স ফিরে গেলেও তিনি তখন কলকাতা ছাড়েন নি, কোম্পানির ঢালাই খানায় কাজ করতে থাকেন।[৩] অনেকে অনুমান করেন অন্যান্য প্রেসের জন্য বাংলা হরফ পঞ্চাননই তৈরি করেন। কোম্পানির প্রেস থেকে পঞ্চাননের তৈরি হরফে ছাপা প্রথম বাংলা বই হল জোনাথন ডানকান অনুদিত ইম্পেকোড। এর পর কোম্পানির প্রেসে মুদ্রিত নিম্নলিখিত বাংলা বই এর হরফ পঞ্চাননই সরবরাহ করেন।

সাল	বই	লেখক	পৃষ্ঠা
১৭৮৪	মফস্বল দেওয়ানী আদালত সকলের সদর দেওয়ানী আদালতের বিচার ও ইনসাফ চালন হইবার কারণ ধারা ও নিয়ম	জোনাথন ডানকান	৪
১৭৮৪	সন ১৭৮১ সালের পঞ্চীমাহ জুলাইতে গভর্নর জেনারেল সাহেবও শ্রীযুক্ত কৌসলী সাহেবরা দেওয়ানী আদালতের যে হুকুমনামা দিয়েছেন তাহার খোলসা	জোনাথন ডানকান	৮২
১৭৮৫	দেওয়ানী আদালতের ধারা ও নিয়ম (দ্বিভাষিক)	জোনাথন ডানকান	—
১৭৮৫	ভারতের দেশীয়দের সম্পর্কে বৃটিশ পার্লামেন্টের এ্যাক্টের বাংলা অনুবাদ	জোনাথন ডানকাল	১৪
১৭৮৭	সন ১৭৮৭ ইংরাজী তারিখের ৮ জুন প্রবল প্রতাপ গভর্নর জেনারেল সাহেব কৌসলে বসিয়া মালগুজারির সকল কর্মের বিষয়ে দফাওয়ারী হুকুম করিলেন এ কারণে এই দফা জমিদার ও ইজারাদারদিগের এবং যে সকল জিলাদার সাহেবরা তাবেকাক্ষে ইহাদের স্থানে এলাকা রাখে তাহা খোলসা নিকালা যাইলে লিখা যাইতেছে।	জি সি মেয়ার	২৪
১৭৮৭	সপসল দেওয়ানী আদালত সকলের ও সদর দেওয়ানী আদালতের বিচার ও ন্যায়ের কার্যের নিমিত্তে ১৭৮৭ইং ২৭ জুন যে ধারা ও নিয়ম সাব্যস্ত হইল তাহা সকলের জ্ঞাত করণের তর্জমা হইয়া নামেতে লিখা যাইতেছে।	জি সি মেয়ার	৮৮
১৭৮৭	ফৌজদারী আদালতের বিধি (পূর্বরূপ)	ঐ	২৪
১৭৮৭	এদেশীয় সকল তাঁতী লোক অধিকন্তু যাহারা শ্রীযুক্ত কোম্পানি সরকার ব্যাপারে নিযুক্ত আছে তাহারদিগের পক্ষে যে হুকুমনামা নির্ধারিত হইয়াছে	ঐ	১২

	তাহার তর্জমা এই।		
১৭৮৯	Additional Supplement to the regulations for Weavers (English, Persians & Bengali)	ঐ	১৪
১৭৯১	Bengali translation of regulations for the administration of justice in the Fouzdary Criminal Courts		
১৭৯২	কালিদাস ঋতুসংহার (বাংলা হরফে সংস্কৃত)	এডমন্ড মরিস	৬৮
১৭৯২	Regulation for the guidance of the Magistrates (Beng. Tr.)	এন বি এডমন্ডস্টোনে	২৬
১৭৯৩	Bengali Translation of the regulations passed by the Governor General in Council during the year 1793	এইচ পি ফর্ষ্টস্টারস্	৭৪

১৭৯৪	ঐ	১৭৯৪	ঐ	৯৪
১৭৯৫	ঐ	১৭৯৫	ঐ	৮২
১৭৯৬	ঐ	১৭৯৬	ঐ	৫৪
১৭৯৭	ঐ	১৭৯৭	ঐ	৮০
১৭৯৮	ঐ	১৭৯৮	ঐ	২৮
১৭৯৯	ঐ	১৭৯৯	ঐ	৩৬

কোম্পানি প্রেসের বাংলা বই এর হরফ পঞ্চাননই তৈরি করেন। তিনি কলকাতার অন্যান্য প্রেসকেও বাংলা হরফ সরবরাহ করেন। কলকাতায় এই সময় হরফ শিল্পের প্রসার লাভ করে নি। এখানে মুদ্রণ চালু হবার ১৩/১৪ বছর পরেও নাগরী হরফ তৈরি হয়নি। তাই দেখা যায় ১৭৯২ সালে কালিদাসের ঋতুসংহার নামে সংস্কৃত বইটি বাংলা হরফে ছাপা হয়েছে। এতে সহজে বোঝা যায় পঞ্চানন কলকাতায় কাজ করে সন্তুষ্ট ছিলেন না। কলকাতায় তিনি স্ত্রী, কন্যা ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনকে নিয়ে এসে ছিলেন কি না, বা কলকাতায় স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হবার চেষ্টা করেছিলেন কি না তাও জানা যায় না। তবে শ্রীরামপুরে প্রেস হবার ৩/৪

মাসের মধ্যেই তাঁর শ্রীরামপুরে চলে যাওয়া থেকে অনুমান করা যায় কলকাতায় তিনি স্থায়ী হতে চাননি। শ্রীরামপুরে আসার ২/৩ বছরের মধ্যে তিনি যেরূপ দ্রুততার সঙ্গে হরফ শিল্পের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি ও প্রসার করেন, তার তুলনায় কলকাতায় দীর্ঘ কুড়ি বছরে কিছুই করতে পারেনি। এ থেকে সহজেই বোঝা যায় কলকাতায় সিভিলিয়ানরা তাঁকে বিশেষ সুযোগ সুবিধা দেননি। পঞ্চাননের কলকাতা ছেড়ে আসার এইটাই বোধহয় প্রধান কারণ। আর্থিক সুবিধার আশা গরীব মিশনারীদের কাছে যে ছিল না, তা তিনি নিশ্চয়ই ভালো করে জানতেন। ১৭৮৫ সালে উইলকিন্স ইংলন্ডে ফিরে যাবার পর কোম্পানি প্রেসের দায়ীত্ব যে সব সরকারি কর্মচারী পান, তাঁরা হয়ত এদেশে দেশীয় হরফ তৈরি করা ব্যাপারে উৎসাহী ছিলেন না, একমাত্র কোলব্রুক পঞ্চাননের সাহায্যে দেবনগরী হরফ তৈরি করানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু, অনুমান করা যায় এ ব্যাপারে হয়ত পঞ্চানন কোন অনুপ্রেরণা পাননি, তাই এ সময় কলকাতায় দেবনাগরী হরফ তৈরি হয়নি। কলকাতায় পঞ্চানন কাউকে হরফ তৈরির কাজ শিখিয়েছিলেন কি না জানা যায় না, অথচ শ্রীরামপুরে এসেই তিনি একদল সহকর্মীকে হরফ খোদাই এর কাজ শিখিয়ে দেন। পঞ্চাননের কলকাতা থেকে শ্রীরামপুরে আসা একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। কাহিনীকার শম্ভুচরণ মুখার্জি। তাঁর নোট বই থেকে বিষয়টি আলোচনা করেন এস সি সান্যাল।[৫] কাহিনীটি বিবৃত করার আগে শম্ভুচন্দ্র জানান যে তিনি ঘটনাটি পঞ্চাননের নাতি কৃষ্ণচন্দ্রের কাছ থেকে শুনেছেন। কাহিনীতে বলা হয়েছে যখন পঞ্চানন কোলব্রুকের কাছে কলকাতায় কাজ করছেন, কেরী তখন পঞ্চাননকে শ্রীরামপুরে আনার জন্য আবেদন জানান, কোলব্রুক কিন্তু রাজি হন নি। অনেক অনুনয় বিনয় করে কোলব্রুককে রাজি করাতে না পেরে তিনি কয়েকদিনের জন্য ধার করে পঞ্চাননকে শ্রীরামপুরে নিয়ে যান এবং দিনেমার সরকারের সাহায্যে তাঁকে আটকে রাখেন। ঘটনাটি বিশ্বাস করার মত কোন তথ্য পাওয়া যায় না, বরং কেরীকে হেয় করার একটি অনুদার প্রয়াস বলে মনে হয়। মিশনের, কোলব্রকের বা কোম্পানি সরকারের কোন বিররণীতে এই ঘটনার উল্লেখ নেই। সে যুগের মিশন বিরোধী পত্রিকাগুলিও কেউই এরূপ ঘটনার কথা বলেন নি। কোলব্রুকের সঙ্গে কেরীর বিরোধ হলে কোম্পানি সরকার কেরীর প্রতি অসন্তুষ্ট হবার কথা, কিন্তু পঞ্চানন শ্রীরামপুরে আসার এক বছরের মধ্যেই সরকার কেরীকে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলার শিক্ষকতার পদ গ্রহণের সাদর আমন্ত্রণ জানায়। ঐ ঘটনা সত্য হলে এরূপ

আমন্ত্রণ কেরী কখনই পেতেন না, কোলব্রুকের সঙ্গে কেরীর ঘনিষ্ঠতাও গড়ে উঠত না। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের সবচেয়ে প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিল। পঞ্চাননকে নিয়ে কেরী কোলব্রুকের লড়াইএর পটভূমিতে মিশন প্রেসের প্রতি কোম্পানি সিভিলিয়ানদের সদয় হওয়াটা স্বাভাবিক নয়। তাই কাহিনীটির গ্রহণীয় হবার যোগ্যতা নেই। এই কাহিনী দিয়ে বলা হয়েছে পঞ্চানন সে সময় সর্বশ্রেষ্ঠ হরফ শিল্পী, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর শিল্প দক্ষতা ও কৃতিত্ব প্রচার করার কোন প্রয়াস দীর্ঘ ২০ বছরে করা হয়নি। তাই কেরীর অগৌরবের জন্যই কাহিনীটি তৈরি করা হয়।

কলকাতার চেয়ে বেশি টাকা পাবার আশায় পঞ্চানন যে শ্রীরামপুরে আসেন, তাও বোধহয় নয়। কারণ, অনুদান ও দানের ওপর নির্ভর করে ছজন মিশনারী সপরিবারে শ্রীরামপুরে আসেন। তাঁদের নিজেদের থাকার, স্কুলের, প্রেসের প্রভৃতির জন্য বাড়ি সংগ্রহ করতেই সংগৃহীত সব অর্থ ব্যয় হয়ে দুহাজার টাকা বেশি ধার হয়ে যায়। ছোট উপনগরীর গভর্নরের মৌখিক আশ্বাসের ওপর নির্ভর করে এত বড় ঝুঁকি নিলেও ভবিষ্যত সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হবার সুযোগ তখনও তাঁদের হয়নি। তাই পঞ্চাননকে জোর করে রাখা বা আশ্বাস দিয়ে রাখার মনোবল মিশন গড়ার তিন চার মাসের মধ্যে তাঁদের হয়নি। কেরীর সদয় ব্যবহার নিশ্চয়ই পঞ্চাননকে মুগ্ধ করেছিল এবং তিনি বুঝেছিলেন শ্রীরামপুরে 'অর্ধসভ্য' মানুষ বলে কেউ তাঁকে ঘৃণা বা উপেক্ষা করবেন না। পঞ্চানন স্বইচ্ছায় কলকাতা ছেড়ে শ্রীরামপুরে আসেন এ সত্য স্বীকার অনায়াসেই করা যায়।

উল্লেখপঞ্জী

১। নিশীথরঞ্জন রায় ঃ তিন পথিকৃৎ, দুই শতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন গ্রন্থে অন্তর্ভুত, পৃঃ ৫৬

২। Shaw Graham : Calcutta Printing to 1800

৩। মুখোপাধ্যায় বরুণকুমার ঃ বাংলা মুদ্রণের চারযুগ, দুই শতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন, পৃঃ ৯১

৪। Shaw Graham : Calcutta Printing to 1799

৫। Sanyal S. C : Secretary's Note Book in Bengal Past and Present vol. VIII July-Sept. 1917.

৪

শ্রীরামপুর মিশনের মুদ্রণ প্রকল্পের পটভূমি ও সূচনা (১৭৯৩-১৮০০)

শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের সূচনা, াবকাশ ও সমাপ্তি—এই তিনটি অধ্যায়ই ইতিহাসের অমোঘ পরিণতির সাক্ষ্য বহন করে। পূর্ব পরিকল্পনা মত কোন প্রস্তুতি ছিল না এই শিল্প সংগঠনের। পরিবেশ ও পরিস্থিতির নির্দেশেই সল্পখ্যাত দিনেমার উপনগরী শ্রীরামপুর ইংরেজ ব্যাপিটিষ্ট মিশনারীদের আশ্রয় দেওয়ার ফলে ইতিহাসে গৌরবময় মুদ্রণ শিল্প সংগঠনের অধিকারী হবার সৌভাগ্য লাভ করে।

মিশন প্রেস প্রতিষ্ঠার পটভূমিতে আছে ১৭৯২ সালে উইলিয়াম কেরীর প্রচেষ্টায় ইংলন্ডে ব্যাপটিষ্ট মিশনের প্রতিষ্ঠা এবং তার প্রতিনিধিরূপে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশে কেরীর ১৭৯৩ সালে বাংলায় আগমণ। দেশের মানুষের মাতৃভাষায় ধর্ম প্রচার করার উদ্দেশে তিনি বাইবেল বাংলায় অনুবাদ করার এবং অনুদিত গ্রন্থ মুদ্রিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এদেশে এসে বাংলা ভাষা শিখেই তিনি বাইবেল অনুবাদ শুরু করেন। কর্মসূচিতে ধর্ম প্রচারের সঙ্গে বাইবেলের বাংলা অনুবাদ সমান গুরুত্ব পায়। কিন্তু নিজে মুদ্রণের দায়িত্ব নেবার কথা তিনি তখন সচেতনভাবে মনে করেন নি। তবে হয়ত চিন্তাটা তাঁর অবচেতন মনে ইংল্যান্ড ছাড়ার আগেই ছিল। কারণ, ইংলন্ড ছাড়ার কিছু আগে ডার্বিতে তাঁর সঙ্গে মুদ্রণ বিশারদ উইলিয়াম ওয়ার্ডের (তিনিও ব্যাপটিষ্ট) দেখা হয়। তিনি ওয়ার্ডকে বলেন, "আমরা এগিয়ে যাচ্ছি, ঈশ্বর যদি দয়া করেন তবে ভবিষ্যতে তোমার মত দক্ষ মুদ্রাকরের প্রয়োজন হবে। আশাকরি, আমাদের সাহায্য করতে সে সময় এগিয়ে

FIRST PAGE
1300-1801

মঙ্গল সমাচার মাতিউর রচিত

১ প্রথম পর্ব্ব

এ আবরহামের সন্তান দাউদের সন্তান যেশু খ্রীষ্টের পূর্ব্বপুরুষের পুস্তক

আবরহাম জন্ম দিল য়িজহাককে এবং য়িজহাক জন্ম দিল য়াকুবকে ও য়াকুব জন্ম দিল য়িহোদা ও তাহার ভ্রাতার দিগকে এবং য়িহোদা জন্ম দিল পরজ ও জরহ তমরের গর্ব্ভ হইতে এবং পরজ জন্ম দিল হজরোন ও হজরোন জন্ম দিল রামকে এবং রাম জন্ম দিল অম্মিনদব ও অম্মিনদব জন্ম দিল নাহশোনকে এবং নাহশোন জন্ম দিল শালমাকে এবং শালমা জন্ম দিল বওজকে রহবের গর্ব্ভে ও বওজ জন্ম দিল ওবেদকে রোতের ওদরে এবং ওবেদ জন্ম দিল য়িশিকে তারপর য়িশি জন্ম দিল দাউদ রাজাকে এবং দাউদ রাজা জন্ম দিল শলমানকে তাহার গর্ব্ভে যে পূর্ব্বে ছিল আওরীয়ের জায়া এবং শলমান জন্ম দিল রহবিয়মকে ও রহবিয়ম জন্ম দিল আবীয়া ও আবীয়া জন্ম দিল আসাকে অতঃপর আসা জন্ম দিল য়িহোশাফটকে এবং য়িহোশাফট জন্ম দিল য়োরামকে ও য়োরাম জন্ম দিল ওজীয়কে এবং ওজীয় জন্ম দিল য়োতমকে ও য়োতম জন্ম দিল আহজকে ও আহজ জন্ম দিল হিজকীয়া.

ক

শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের প্রথম বই-এর প্রথম পৃষ্ঠা

আসবে।"[১] বাংলাদেশে উপস্থিত হবার পর থেকেই কেরী বাইবেল অনুবাদের স্বপ্ন দেখেন এবং অবচেতন মনে থাকে নিজে মুদ্রণ পরিচালনা করার অভিলাষ। ১৭৯৩ সালের ১৩ নভেম্বর এদেশে পদার্পণ করার পর থেকে ১৭৯৪ সালের জুন মাস পর্যন্ত কেরীকে সপরিবারে স্থায়িত্বের জন্য প্রচণ্ড লড়াই করতে হয়। কিন্তু তারই মধ্যে তিনি রামরামবসুকে মুনশী নিয়োগ করে বাংলা শেখা শুরু করেন। ১৭৯৪ এর জুনে তিনি উত্তরবঙ্গের মদনাবতীতে আসেন জর্জ উডনীর নীল কুঠিতে ম্যানেজার হয়ে। এখানে স্থিতু হয়ে তিনি পুর্নোদ্যমে বাংলা, সংস্কৃত ও হিন্দুস্থানী শেখা শুরু করেন, আর সেই সঙ্গে চলে তাঁর বাইবেল অনুবাদের প্রয়াস। বাইবেল অনুবাদ ছাপার কথা তখন থেকেই তিনি ভাবতে শুরু করেন। অনুবাদের কাজ যত এগোয় ছাপার জন্য কেরীর অধীরতা তত বাড়ে। ইংলন্ডের সোসাইটির সাহায্যে লণ্ডনেই অনুবাদ ছাপাবার কথা প্রথমে ভাবেন এবং সোসাইটির ওপর সব ব্যয়ভার না চাপিয়ে তিনি কিছু অর্থ সাহায্যের কথাও চিন্তা করেন। সেজন্য নিজের আয় থেকে কিছু সঞ্চয় করতে থাকেন। ১৭৯৫ সালের জানুয়ারি মাসের চিঠিতে তিনি অনুবাদ ছাপা সম্বন্ধে তাঁর দুশ্চিন্তার কথা জানিয়ে ইংলন্ডের সোসাইটিকে লেখেন, "বাংলা হরফ তৈরির জন্য কিছু নমুনা পাঠাতে চাই। মুদ্রণের ব্যয়ের কিছু অংশ আমি গ্রহণ করব।"[২] এই চিঠি থেকে বোঝা যায় এদেশে ছাপার অগ্রগতি সম্বন্ধে কেরী তখন কিছুই জানতেন না এবং এদেশে মুদ্রণ করাবার কথা চিন্তাও করেন নি। কিন্তু তিনি জানতে পারেন লন্ডনের বিখ্যাত হরফ প্রস্তুতকারক ক্যাসলন একটা হরফের জন্য ১ গিনি নেবেন, অর্থাৎ কয়েক হাজার পাউন্ড দরকার এক ফাউন্ট বাংলা হরফ তৈরি করতে।[৩] এ পরিমাণ অর্থের স্বপ্ন দেখতে কেরী তখন ভয় পেতেন, বাধ্য হয়ে কেরীকে এদেশে মুদ্রণের সন্ধান নিতে হয়। তিনি ১৭৯৫ সালের ১৪ই জুন রাইল্যান্ডকে লেখেন, "তোমরা মুদ্রণ যন্ত্র পাঠাও, এদেশীয় কর্মীদের দিয়ে আমি ছাপার কাজ করিয়ে নিতে পারবো।"[৪] ইংলন্ডের সোসাইটি তাঁর আবেদনে কান না দেওয়ায় তিনি খুব ভেঙে পড়েন। ঠিক সেই সময় তাঁকে সাহায্য করার জন্য জন ফাউন্টেনকে লন্ডনের সোসাইটি পাঠালে তিনি আবার উৎসাহের সঙ্গে কাজ শুরু করেন এবং সোসাইটিকে প্রেস পাঠাবার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু সোসাইটি বাইবেল ছাপানোর বিষয়ে কোন আগ্রহই দেখায়নি। ক্ষুব্ধ কেরী তখন

থেকেই গুরুত্ব দিয়ে চিন্তা করেন তিনি নিজেই ছাপার ভার নেবেন। তার আগে কলকাতায় ছাপানো সম্ভব কিনা খোঁজ নেন এবং জানতে পারেন যে ১০,০০০ কপি ৬০০ পাতার বাইবেল ছাপাতে খরচ পড়বে ৪৩৭৫০ টাকা।[৫] তাছাড়া এক ফাউন্ট বাংলা হরফ তৈরি করাতে আলাদা খরচ পড়বে। এই বিপুল পরিমাণ অর্থব্যয় করা কেরী বা মিশন সোসাইটির সামর্থের বাইরে ছিল। বাধ্য হয়ে কেরীকে ছাপার কাজের ভার নিজে নেবার জন্য চেষ্টা শুরু করতে হয়। তাই দেখা যায় ছাপার কাজ করার কর্মসূচি তাঁর প্রাথমিক পরিকল্পনায় না থাকলেও পরিস্থিতির চাপে তাঁকে আসতে হয় এই কর্ম ক্ষেত্রে। তাছাড়া ইংলন্ডের সোসাইটির আগ্রহের অভাব তাঁর নিজের ওপর নির্ভর করার দৃঢ়তা অনেক বাড়িয়ে দেয়। এই সময় ওয়ার্ডের কথাও তাঁর বিশেষ করে মনে পড়ে। ১৭৯৬ সালের ১৬ নভেম্বর তিনি ইংলন্ডের কমিটিকে লেখেন, "আমাকে একটি মুদ্রণ যন্ত্র, কাগজ ও অন্যান্য দ্রব্য পাঠিয়ে দাও। আর যদি কোন দক্ষ মুদ্রাকর মিশনে যোগ দিতে চান তবে তাঁকেও পাঠাও। ইংলন্ড ত্যাগ করার আগে ডার্বিতে এরূপ একজনের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল।"[৬] ১৭৯৬ সালে তিনি যখন কলকাতায় ছাপার খবরের কথা জানতে আসেন তখনও বোধ হয় পঞ্চাননের টাইপ ফাউন্ড্রীর ভালো পরিচয় পাননি। পরের বছর অর্থাৎ ১৭৯৭ সালে এই ফাউন্ড্রীর খবর পান। ১৭৯৭ সালের ডিসেম্বরে তিনি এক সেট বাংলা হরফ আগেই তৈরি করিয়ে নেবার কথা ভাবেন। ১৭৯৮-এর ১লা জানুয়ারি চিঠিতে লেখেন, "দেশীয় ভাষায় হরফ তৈরির জন্য কলকাতায় একটি ঢালাইখানা কিছুদিন হল স্থাপিত হয়েছে। আমার মনে হয় সেখানে সস্তায় হরফ পাওয়া যাবে এবং আমাদের বাইবেল ছাপার কাজে তা বেশ উপযোগী হবে। ইউরোপে ঢালাই করা দেশীয় হরফের চেয়ে এগুলি ভালো বলে শুনেছি।"[৭] কিন্তু ইংলন্ডের কমিটির অনুমোদনের অপেক্ষা না করে তিনি ১৭৯৮ সালের প্রথম দিকেই কলকাতায় কোম্পানির হরফ ঢালাইখানায় এক সেট বাংলা হরফের অর্ডার দেন। তিনি ঠিক করেন নিজের জমানো টাকা দিয়ে বাংলা হরফ আগে কিনে রাখবেন। কলকাতায় অনুসন্ধান করে জানেন প্রতি হরফের জন্য ৫ শিলিং এবং পুরো ফাউন্টের জন্য ৫০০ পাউন্ড খরচ হবে। বি এম প্রেসের মুদ্রাকর নরম্যান এলিস এ সম্পর্কে বলেছেন, "হাতে হরফ সাজানোর ক্ষেত্রে কোন বইয়ের কাজের জন্য দু'সেট রোমান হরফ

থাকাই যথেষ্ট। কিন্তু কোন ভারতীয় ভাষায় বই ছাপার জন্য দরকার হয় অন্ততঃ সাতটা সেট হরফ। সেজন্য এটা অস্বাভাবিক নয় যে একই আকারের হরফে দেশীয় ভাষায় বই ছাপার জন্য প্রয়োজন হয় দু'হাজার পাউন্ড ওজনের হরফ। খুব কম করে হলেও প্রতি পাউন্ড হরফের জন্য খরচ পড়ে তিন টাকা।"[৮] এলিস সে সময় হরফের জন্য খরচের যে হিসেব দিয়েছেন, কেরী কিন্তু তার চেয়ে সস্তায় হরফ জোগাড় করেন পঞ্চাননের কাছ থেকে। কিন্তু কেরী আবার দুর্ভাগ্যের চাপে পড়েন, ইংলন্ডের সোসাইটি মুদ্রণ যন্ত্র ও মুদ্রাকর তখনও জোগাড় করতে পারে নি। কেরী জর্জ উডনীর যে নীল কুঠির ম্যানেজার ছিলেন সেই কুঠির অবস্থা খারাপ হওয়ায় উঠে যাবার মত হয়। উড়নী কেরীর কথা চিন্তা করে ক্ষতি সত্বেও কিছুদিন কুঠি চালান। সবদিক থেকে প্রতিকূল অবস্থায় পড়ে বিপর্যস্ত হলেও কেরী তাঁর মানসিক দৃঢ়তা হারান নি। বাইবেল ছাপার চিন্তাও তাঁকে এক মুহূর্তও ছেড়ে যায় নি। ঠিক এর কিছু পরেই কলকাতার কাগজে বিজ্ঞাপন দেখা যায় যে ইংলন্ড থেকে সদ্য আগত জিনিসপত্রের মধ্যে একটি প্রেস নীলাম হবে। খবরটি পড়ে কেরী লাফিয়ে ওঠেন। প্রেসটির প্রতি কেরীর আগ্রহের কথা জেনে জর্জ উডনী ৪০ পাউন্ড দিয়ে প্রেসটি কেনেন এবং কেরীকে উহা উপহার দেন।[৯] ১৭৯৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে নৌকা করে প্রেসটি মদনাবতীতে এলে কেরী ও তাঁর সহকারী ফাউন্টেন এতো হইচৈ করেন যে স্থানীয় লোকেরা মুদ্রণ যন্ত্রটিকে বলে 'সাহবেদের ঠাকুর'। ১৭৯৮ সালের গোড়ার দিকে কেরী কলকাতায় যান বাংলা হরফ আনার জন্য। তাঁর বাংলা নিউটেষ্টামেন্ট অনুবাদ অনেক দিন শেষ হয়েছে এবং তিনি বইটি ছাপার জন্য অধীর হলেও তাড়াতাড়ি কিছু করতে পারছিলেন না। ১৭৯৯ সালের ১লা এপ্রিল তিনি বন্ধু রাইল্যান্ডকে লেখেন, "আমাদের প্রেস আছে, বাংলা হরফ তৈরি করবার কিছু অর্থও জোগাড় করেছি। একজন লোকের সন্ধান পেয়েছি যে হরফ তৈরি করতে পারে। কোম্পানির হরফ ঢালাইখানায় সে কাজ করে। কলকাতার একজন মুদ্রাকরকে নিযুক্ত করেছি হরফ ঢালাই তত্ত্বাবধান করার জন্য। কাজ শুরু হয়ে গেছে, আশা করছি দু'মাসের মধ্যে কাজ শেষ হবে।"[১০] অনুমান করা যায় কলকাতায় হরফ তৈরির নির্দেশ দিতে গিয়ে কেরী পঞ্চাননের পরিচয় পান এবং তাঁর সঙ্গে পঞ্চাননের আলাপ হয়। উভয়ে উভয়কে পছন্দ করেন বলে মনে হয়। হয়ত কেরী

তাঁকে উত্তরবঙ্গে যাবার কথা বলে, অনেক দূরে যেতে হবে বলে পঞ্চানন রাজি হতে পারেন নি। তাই কেরীর শ্রীরামপুরে আসার খবর পেয়েই পঞ্চানন শ্রীরামপুরে চলে আসেন।

আঠারো শতকের শেষ লগ্নে কেরী ও পঞ্চাননের ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকারের মধ্যেই সুপ্ত থাকে শ্রীরামপুরের মুদ্রণ শিল্পায়নের সম্ভাবনার বীজ। কিন্তু কেরী কলকাতা থেকে মদনাবতীতে ফিরে এসেই দুঃসংবাদ পান যে উডনী নীল কুঠি বন্ধ করে দিয়েছেন এবং তিনি হয়েছেন বেকার। কেরী পড়ে যান খুব দুশ্চিন্তায় এবং তাড়াতাড়ি ছাপার জন্য জমানো টাকা দিয়ে মদনাবতীর কাছে খিদিরপুরে একটি ছোট নীল কুঠি কিনে সেখানে চলে আসার ব্যবস্থা করেন। আবার বছরের ঠিক শেষের দিকে খবর পান তাঁর কাজে সাহায্য করার জন্য ইংলন্ডের সোসাইটি আরও চারজন মিশনারীকে পাঠিয়েছে। শীঘ্রই তাঁরা এসে পড়বেন। আরও শুভ খবর পানে যে ঐ মিশনারীদের মধ্যে একজন কেরী পরিচিত দক্ষ মুদ্রাকর উইলিয়াম ওয়ার্ড। কেরী তাড়াতাড়ি চারটি মিশনারী পরিবারের খিদিরপুরে থাকার বন্দোবস্ত করেন এবং অধীর আগ্রহের সঙ্গে তাঁদের জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন।

ইতিমধ্যে কেরী ছাপার কাজ শুরু করার জন্য তৎপর হন। তিনি হিসেব করে দেখেন ১০০০ কপি নিউটেষ্টামেন্ট ছাপতে পড়বে ২০০০ পাউন্ড। ৫০০ কপি যদি প্রতিটি ৪ পাউন্ড দরে বিক্রি করতে পারেন তবে বাকি ৫০০ কপি বিতরণ করতে পারবেন। কিন্তু টাকার জন্য তিনি যখন খুব চিন্তিত তখন ইংলন্ড থেকে খবর আসে কেরীর বাইবেলের অনুবাদ ছাপানোর জন্য এডিনবরা মিশনারী সোসাইটি দু'হাজার পাউন্ড দান করেছে। টাকার চিন্তা দূর হলেও কেরী মদনাবতীতে কাজ শুরু করতে পারেন না মুদ্রাকরের অভাবে। কলকাতার মুদ্রাকরেরা মদনাবতীতে আসতে রাজি হয়না। তবু ফাউন্টেনের সাহায্যে কেরী টাইপ সাজিয়ে ছাপার কাজ আরম্ভ করার চেষ্টা করেন, কিন্তু মনে হয় সফল হন নি, কারণ তাঁর রিপোর্টে এ সম্পর্কে কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। সম্প্রতি বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত 'কেরী যখন দিনাজপুরে' গ্রন্থে লেখক বলেছেন বাংলা ছাপার কাজ মদনাবতীতেই কেরী শুরু করেন।[১১] কিন্তু এ সম্পর্কে গ্রহণযোগ্য কোন তথ্য পাওয়া যায় না। অনুমান করা যায় ছাপার চেষ্টা করলেও কেরী সফল হন নি। কারণ এই সময়েই তাঁকে মদনাবতী ছেড়ে

খিদিরপুর যেতে হয়।

এরপর বেশ নাটকীয়ভাবে পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়। কেরী যখন অধীর আগ্রহে নতুন মিশনারীদের অভ্যর্থনা করার জন্য অপেক্ষা করছেন, তখন ওয়ার্ড শুধু এসে তাঁকে নতুন মিশনারীদের উপস্থিতি সম্বন্ধে বিশেষ দুঃসংবাদ দেন। নতুন মিশনারীরা বিতাড়িত হবার ভয়ে কোম্পানির রাজত্বে অবতরণ না করে দিনেমার নগরী শ্রীরামপুরে আশ্রয় নেন। শুধু আশ্রয় নয় দিনেমার গভর্নর তাঁদের নিরাপত্তার আশ্বাসও দিয়েছেন। কিন্তু তাঁদের জাহাজের ক্যাপ্টেন তাঁদের আনার জন্য বিপদে পড়েন। কোম্পানির চ্যাপলেনের সাহায্যে কোন রকমে তাঁরা রক্ষা পান। কোম্পানির চ্যাপলেনের অভিমত, যেহেতু কোম্পানি মিশনারীদের প্রতি বিরূপ সেজন্য কোম্পানির রাজ্যের মধ্যে তাঁদের থাকা নিরাপদ নয়। এদিকে দিনেমার গভর্নর নিরাপত্তা এবং সবরকমের সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন। ওয়ার্ডের কাছ থেকে এই বিবরণ শুনে কেরী উভয় সংকটে পড়েন। উত্তরবঙ্গে ছ'বছরের মত থেকে তিনি ধর্ম প্রচার ক্ষেত্র গড়ে তোলেন এবং স্থায়ী মিশন কেন্দ্র গড়ার জন্য খিদিরপুরে নীলকুঠি গড়েছেন, খামার তৈরি করেছেন, বিদ্যালয় করেছেন। তৈরি জমি ছাড়তে তিনি মন থেকে সায় পাননা। আবার ওদিকে কোম্পানি সজাগ হয়েছে, উত্তরবঙ্গে মিশনের কাজ করা যাবে না। সব দ্বিধা কাটিয়ে উত্তরবঙ্গের তৈরি জমি ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেন শুধু শ্রীরামপুরে বাইবেল ছাপা সুবিধা হবে বলে। দক্ষ মুদ্রাকর ওয়ার্ড এসে গেছে, বাইবেল ছাপার আর কোন অসুবিধা নেই। তাই খিদিরপুরের সম্পত্তি বিক্রি করে মুদ্রাযন্ত্র, টাইপ ও অন্যান্য জিনিস নিয়ে শতাব্দীর শেষ লগ্নে ওয়ার্ডের সঙ্গে সপরিবারে কেরী শ্রীরামপুরের দিকে যাত্রা করেন। এই পটভূমিতে শ্রীরামপুর ভারতে মুদ্রণ শিল্প সংগঠনের গৌরবময় ভূমিকা গ্রহণের সুযোগ পায়।

উইলিয়াম কেরী ভারতের নবজাগরণের অন্যতম পুরোধা, তিনি ঊনিশ শতকের ঊষালগ্নে (১০ই জানুয়ারি ১৮০০) শ্রীরামপুরে উপস্থিত হন আর গঠন করেন শ্রীরামপুর মিশন। শ্রীরামপুরে এসে কেরী একদিনও নষ্ট করতে চাননি। মিশন তৈরি করে নিয়মাবলী রচনা করেন এবং কাজের দায়িত্ব নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেন। প্রেসের দায়িত্ব পড়ে ওয়ার্ডের ওপর, তার সহকারী হন নবাগত মিশনারী ব্রান্সডন ও কেরীর পুত্র ফেলিকস্। প্রথমেই দেখা দেয় প্রেসের জন্য স্থান সমস্যা। ওয়ার্ড, মার্শম্যান, ব্রান্সডন ও গ্রান্ট প্রমুখ মিশনারীরা কেরীর আগে

শ্রীরামপুরে এসে মাসিক ১২০ টাকায় একটি বাড়িতে ভাড়া করেন। কেরী ফাউন্টেন এলে সেই বাড়ি ছটি পরিবারের স্থান সংকুলানের অসুবিধা হয়। এরপর প্রেস বসাবার ঘর পাওয়া যায় না। কেরী বেশ দুশ্চিন্তায় পড়ে যান। কারণ সে সময় শ্রীরামপুরে বাড়ি ভাড়ার হার ছিল খুব বেশি। সৌভাগ্যক্রমে তাঁরা সন্ধান পান গঙ্গার ধারে জমি সমেত একটি বড় বাড়ি বিক্রি হবে। নিজেদের আর্থিক সংগতির কথা না ভেবেই কেরী এগিয়ে যান বাড়িটা কিনতে। বাড়িটির দাম পড়ে ৬০০০ টাকা। সকলের টাকা মিলিয়ে পাওয়া যায় ৪০০০ টাকা, কেরী তাঁদের ক্যাপ্টেন উইকেস্ এর কাছ ২০০০ টাকা ধার নিয়ে বাড়িটি কিনে ফেলেন।[১২] এই আর্থিক ঝুঁকিটা নেবার পর থেকেই কেরী অর্থ উপার্জনের প্রতি বিশেষ নজর দেন। নিজেদের ভরণ পোষণের জন্য নিজেরা উপার্জন করবেন বলে ঠিক করেন এবং লন্ডন কমিটির অনুদান দিয়ে মিশনের কাজ করার সিদ্ধান্ত নেন। প্রেসকে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে চালাবার কথা তখনই চিন্তা করেন।

মিশন প্রতিষ্ঠার ঠিক পরেই ওয়ার্ডের নেতৃত্বে প্রেস এবং মার্শম্যান দম্পতির পরিচালনায় বোর্ডিং স্কুল হয় শ্রীরামপুর মিশনারীদের অর্থাগমের প্রধান উপায়। কেরী যে দূরদৃষ্টি ও বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে মুদ্রণ শিল্প সংগঠন করেন তা যে কোন শিল্পপতির কাছে অনুকরণীয় আদর্শ। এই প্রেসের সংগঠন ও কার্যাবলী সম্পর্কে কোন কাগজ পত্র পাওয়া যায় না। অনুমান করা যায় ১৮১২ সালে প্রেসে যে আগুন লাগে তাতে কাগজ পত্র সব পুড়ে যায়। পঞ্চাননের শ্রীরামপুরে মিশন প্রেসে যোগদান সম্পর্কিত কোন তথ্যও তাই পাওয়া যায় না। তবু মিশনারীদের দিনলিপি, চিঠিপত্র, মিশন পরিবারের পারিবারিক হিসাব বই প্রভৃতির মধ্যে পঞ্চানন সম্পর্কে কিছু কিছু উল্লেখ পাওয়া যায়।

কেরী শ্রীরামপুরে আসার এক সপ্তাহের মধ্যেই বাড়ি কেনা হয়। যদিও প্রেসের কাজ আরম্ভ হবার সঠিক তারিখ জানা যায় না, তবু অনুমান করা যায় ওয়ার্ড একটা দিনও নষ্ট করেন নি এবং মিশন হাউসে (ক্রীত বাড়ি) যাবার আগেই তিনি ভাড়া বাড়ির একটা ঘরে প্রেস বসিয়ে হরফ সাজানোর কাজ ফেলিক্সের সাহায্যে শুরু করেন। ওয়ার্ডের দিনলিপি থেকে জানা যায়, "১৮ই ফেব্রুয়ারি ১৮০০ মিশন হাউসে গৃহপ্রবেশ হয়। এই বাড়ির একটি ঘরে প্রেস বসানো হয়।"[১৩] ধরা যেতে পারে মার্চ মাসের প্রথম থেকেই প্রেসের কাজ শুরু হয়। হরফ

তৈরির কথা কেরী তখনও চিন্তা করেন নি। কারণ প্রেসের ছাপার মান কিরকম হবে তখনও তিনি জানেন না। তাই পঞ্চানন মার্চের মধ্যে শ্রীরামপুরে আসেন নি। ওয়ার্ডের দিনলিপিতে ছাপার কথা প্রথম পাওয়া যায় ৪ মার্চ ১৮০০। তিনি দিনলিপিতে লেখেন, "আমাদের একটি কার্ড, মিঃ ডেক্সটারের বিল এবং সেই সঙ্গে নিউটেষ্টামেন্টের বাংলা অনুবাদ ছাপছি।"[১৪] হরফ সাজানো ও ছাপার কাজ ওয়ার্ড নিজের হাতে শুরু করেন, পরে দেশীয় কর্মীদের এই কাজ শিখিয়ে দেন। মুদ্রণ শিল্প গড়ার চিন্তা তখন কেরীর মনের গভীরে গেলেও আর্থিক দায় ও সমস্যার জন্য তিনি খুব সতর্ক থাকেন, কারণ বাড়ি কেনা, প্রেস চালানো ও বোর্ডিং স্কুল করার জন্য বেশ কিছু পরিমাণ দেনা করতে হয়েছে। প্রেস ও স্কুলের সাফল্যের ওপরই নির্ভর করছে তাঁর পরবর্তি পদক্ষেপ। ওয়ার্ডের কর্মধারা দেখে কেরী আগেই মুদ্রণের সাফল্য সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হন। ১৮০০ সালের ফেব্রুয়ারিতে তিনি ফুলারকে লেখেন, "আমি যে রকম লোক খুঁজছিলাম ওয়ার্ড ভাই ঠিক সেই রকম। সমস্ত অন্তর দিয়ে সে কাজে লেগে গেছে।"[১৫] ত্রয়ী সম্মেলন অর্থাৎ কেরী, ওয়ার্ড ও পঞ্চাননের একত্রিত প্রয়াস শুরু হবার আগে, অর্থাৎ প্রথম তিন মাসে প্রেসের কাজ কিরূপ চলে তার একটি চিত্র ওয়ার্ডের দিনলিপি থেকে পাওয়া যায়। ওয়ার্ডের দিনলিপি—[১৬]

মার্চ ৪ ও ৫ ১৮০০ ঃ আমি এখন ছাপাখানায় বসে হরফ সাজাচ্ছি। প্রথম কাজ আমাদের কার্ড ও মিঃ ডেক্সটারের বিল ছাপানো।

মার্চ ১৮, ১৮০০ ঃ ম্যাথুর প্রথম পাতার ছাপ কেরী নিলেন।

মার্চ ২২, ১৮০০ ঃ স্কুলের ও ছাপাখানার বিল ছাপা হয়েছে বাংলা বাইবেলের গ্রাহকের জন্য আবেদনপত্র ছাপা হচ্ছে। কলকাতার পত্রিকা ক্যালক্যাটা গেজেটে বাংলা বাইবেল সম্বন্ধে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে। প্রেসে এখন একজন কম্পোজিটর ও ছাপার কাজের জন্য দু'জন কর্মী রাখা হয়েছে। কম্পোজিটরের বেতন মাসিক কুড়ি টাকা ও কর্মীদের বেতন ৫/৬ টাকা।

মার্চ ২৯, ১৮০০ ঃ আমরা এখন সরকারি কাজের অর্ডার পাচ্ছি।

মে ১৬, ১৮০০ ঃ এই সপ্তাহে নিউটেষ্টামেন্টের ছাপা শুরু হবে। ২০০০ কপি বাংলা কাগজে ছাপব, ২০০০ শুধু ম্যাথু ছাপা হবে এবং ৩০০ কপি বিলিতী কাগজে ছাপা হবে।

বাংলা হরফ সীমিত পরিমাণে থাকায় বাংলা ছাপার কাজ মার্চ মাসে বিশেষ এগোয় নি। মে মাস থেকে পুরোদমে বাংলা ছাপার কাজ শুরু হয়। অনুমান করা যায় মে মাসে পঞ্চানন মিশন প্রেসের কাজে যোগ দেন, কারণ শ্রীরামপুর মিশনের পারিবারিক হিসাবের খাতায় পঞ্চাননের নাম প্রথম পাওয়া যায় ১৮০০ সালের মে মাসে।[১৭] পঞ্চাননকে পাবার পরই অভীজ্ঞ শিল্প সংগঠকের মত কেরী স্বনির্ভরশীল মুদ্রণ শিল্প প্রকল্পের পরিকল্পনা করেন এবং ক্রম পর্যায়ে এই প্রকল্পের রূপায়ণ সূচিও প্রস্তুত করেন। এই প্রকল্পের বৈশিষ্টে ছিল (১) যতদূর সম্ভব দেশীয় উপাদান ও দেশীয় প্রযুক্তিবিদ শিল্পীদের ব্যবহার। (২) উৎপাদনব্যয়কে যতদূর সীমিত রেখে সুলভ মূল্যে মুদ্রিত বস্তু বিক্রয়ের মাধ্যমে মুদ্রণ শিল্পকে জনপ্রিয় করণ। (৩) মুদ্রণের সহযোগী শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে মুদ্রণ ব্যয় হ্রাস করা। (৪) পরিকল্পিত উপায়ে বিভিন্ন ভাষা ও অঞ্চলের মধ্যে মুদ্রণ প্রসারিতকরণ প্রভৃতি।

এই মুদ্রণ সংস্থার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল খৃষ্টধর্মীয় সাহিত্য প্রচার করা, তাই মুদ্রণ ব্যয়কে অল্প রাখার প্রয়াস বিশেষ প্রয়োজনীয় হয়। এই শিল্প পরিচালনার সর্বস্তরে দেশীয় কুশলী কর্মীরা মিশনারীদের সঙ্গে একযোগে কাজ করেন, কিন্তু হরফ শিল্পী পঞ্চানন কর্মকার ছাড়া আর কোন দেশীয় শিল্পীর নাম মিশনারীদের বিবরণীতে পাওয়া যায় না।

উল্লেখপঞ্জী

১) Marshman J.C. : Life and Times of Carey, Marshman and Ward vol, I p. 97

২) Carey Wm : Letter to BMS dt, 6th Jan, 1795

৩) Khan M.S. : William Carey and Serampore Books p. 216 in Vol. II No. 3, 1961

৪) Carey Wm : Letter to Ryland 14th June 1795

৫) দাস সজনীকান্ত ঃ বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ, সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা ৪৫ খণ্ড ২৭৩ পৃঃ।

৬) Carey Wm : Letter to BMS 16th Nov, 1796

৭) Carey Wm : Letter to BMS 1st Jan, 1798

৮) Ellis Norman : ''Indian Typography in the Carey Exgibition Souvenir (national Library Calcutta) p. 10-11

৯) Carey S. P : William Carey p. 173-174

১০) Carey Wm : Letter to Ryland April 1799

১১) আলী মেহেরাব ঃ কেরী যখন দিনাজপুরে, জাতীয় চার্চ পরিষদ, দিনাজপুর জুলাই ১৯৯০

১২) BMS : Periodical Accounts Vol. I p. 203

১৩) Ward William : Jounal (MSS) I 28 Feb. 1800

১৪) Ward William : Journal (MSS) I 4th March 1800

১৫) Carey William : Letter to Fuller Feb, 1800

১৬) Ward William : Journal (MSS) I March to May 1800

১৭) Serampore Mission, Household Account : (MSS) May 1800

৫

শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের হরফ শিল্প ও তার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র—শ্রীরামপুরে পঞ্চানন (১৮০০-১৮০৪)

শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের প্রথামিক সাফল্য কেরীকে শিল্প প্রসারণে উদ্যোগী করে এবং তিনি অর্থ বিনিয়োগের ঝুঁকি নিতে ইতঃস্তত করেন নি। ছাপার কাজ বেড়ে যাওয়ায় বাংলা হরফের নতুন ফাউন্টের বিশেষ প্রয়োজন হয় এবং হরফ ঢালাইখানা গড়ায় কেরীকে তৎপর করে। পঞ্চাননের শ্রীরামপুরে আসায় দ্রুত হরফ ঢালাইখানা গড়ে ওঠে। পঞ্চানন ঠিক কোন দিনে শ্রীরামপুরে আসেন তা জানা যায় না। তবে শ্রীরামপুর মিশনের পারিবারিক হিসাব খাতায় দেখা যায় ১৮০০ সালের ১ মে পঞ্চানন মিস্ত্রীকে হরফ তৈরির জন্য ৪০ টাকা দেওয়া হয়েছে।[১] মে মাসে পঞ্চানন শ্রীরামপুরে আসার পর মিশনের হরফ নির্মাণ কেন্দ্র তৈরি হয় এবং পঞ্চানন তাঁর পরিবার, আত্মীয় স্বজন এবং পরিচিতদের শ্রীরামপুরে আনেন এবং প্রেসও হরফ শিল্পের কাজে লাগিয়ে দেন। কেরী, ওয়ার্ড ও পঞ্চানন এই ত্রয়ী সম্মেলনই শ্রীরামপুর মুদ্রণের গৌরবময় অধ্যায়ের ভিত্তি স্থাপন করে।

শ্রীরামপুরে আসার পর পঞ্চানন মাত্র চার বছর বেঁচেছিলেন। কর্মজীবনের দীর্ঘ কুড়ি বছর নিস্ফল হলেও পঞ্চানন জীবনের শেষ চার বছরেই বহু সম্ভাবনায় একটি বৃহৎ হরফ শিল্পের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন। পরে শ্রীরামপুরের এই শিল্পকেন্দ্র পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রে পরিণত হয়। পঞ্চানন শুধু নিজে প্রতিভাশালী যন্ত্র শিল্পী ছিলেন তাই নয়, তিনি ছিলেন বিশেষ কুশলী প্রশিক্ষক। প্রশিক্ষণের মাধ্যমেই পঞ্চানন ভারতের মুদ্রণ ও হরফ শিল্পে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। শ্রীরামপুরে আসার পর

থেকেই পঞ্চানন প্রেসের প্রয়োজনীয় হরফ সরবরাহ করতে থাকেন এবং প্রেসের কাজও দ্রুত বাড়তে থাকে। এই অগ্রগতি সম্পর্কে ওয়ার্ডের দিনলিপিতে আছে, "১লা আগষ্ট, ১৮০০, কলকাতার মিঃ বি ৬০০ স্পেলিং বুক ছাপার কাজ দিয়েছেন। আমরা এখন তা ছাপছি। আমাদের কম্পোজিটার (দেশীয়) এখন ছুটিতে, তাকে ছাড়াই আমরা কাজ চালাচ্ছি। আমাদের প্রেসে সপ্তাহে ২০০০ কপির তিনটি অর্ধ পৃষ্ঠা ছাপা হচ্ছে। আমাদের প্রেসে কর্মী আছেন পাঁচজন। তাছাড়া একজন মোড়কের ও একজন বাঁধাই এর কাজে নিযুক্ত।[২]

প্রেসের কাজ বাড়ার সঙ্গে হরফ ঢালাই এর কাজও দ্রুত হারে বাড়তে থাকে। পঞ্চাননের একার পক্ষে কাজের ভার সামলানো সম্ভব হয় না। তিনি তাঁর আত্মীয় স্বজন ও কর্মকার পেশার পরিচিত কয়েকজন তরুণকে তাঁর সহকারী নিযুক্ত করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে হরফ শিল্পের একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রও গড়ে তোলেন। তাঁর সুপ্রশিক্ষণের ফলেই মনোহরের নেতৃত্বে সংগঠিত হয় সুদক্ষ হরফ শিল্পীর একটি গোষ্ঠী। এঁরাই পরবর্তিকালে শ্রীরামপুর হরফ নির্মাণ কেন্দ্রের গৌরবময় অধ্যায় রচনা করেন। ১৮০৪ সালে পঞ্চাননের জীবনাবসান হয়। কিন্তু তার জন্য শ্রীরামপুর হরফ শিল্পের উন্নতি ব্যহত হয়নি বরং উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধিই হয়েছিল। শ্রীরামপুর মিশনের বিবরণীতে পঞ্চাননের কৃতিত্বের স্বীকৃতি বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়েছে। শ্রীরামপুর মিশনের অনুবাদের বিররণীতে আছে, "তার (পঞ্চানন) সাহায্যে আমরা একটি হরফ নির্মাণ কেন্দ্র গড়েছি এবং যদিও তিনি এখন মারা গেছেন, কিন্তু, তিনি শিল্পটি অপর কয়েকজনকে এমনভাবে শিখিয়েছেন যে তাঁরা হরফ ঢালাই ও এমন কি হরফ খোদাই এর কাজ এত নিখুঁতভাবে করছেন যে ইউরোপীয় উৎকর্ষতার চেয়ে তা কম নয়।"[৩] বোধ হয় আত্মশ্লাঘা রক্ষার জন্য মিশনারীরা শ্রীরামপুরের প্রাচ্য ভাষার হরফ যে ইউরোপের চেয়ে উৎকৃষ্টতর তা স্বীকার করতে পারেন নি। তা না করলেও পঞ্চানন কর্মকারকে হরফ শিল্পের প্রথম ভারতীয় শিক্ষাগুরু রূপে বন্দনা করা যায়।

বাংলা হরফের নতুন ফাউন্ট তৈরি করা ছাড়া পঞ্চানন শ্রীরামপুরে এসে দেবনাগরী, ওড়িয়া ও মারাঠি হরফ তৈরির কাজ শুরু করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি নাগরী হরফ সম্পূর্ণ করেন, কিন্তু অন্যগুলি বোধ হয় সম্পূর্ণ করতে পারেন নি, তাঁর শিষ্য মনোহর পরে শেষ করেন।

পঞ্চাননের পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কোন তথ্য পাওয়া যায় না। অনুমান করা যায়, শ্রীরামপুরে পঞ্চানন সপরিবারে আসেন এবং কোম্পানি বাগানে (বর্তমান শ্রীরামপুর বটতলার কাছে গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোডের ধারে) বসতি স্থাপন করেন। তাঁর সহকর্মী ও আত্মীয় স্বজনরা একই অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন। পঞ্চাননের কোন পুত্র সন্তান ছিল না, একটি মাত্র কন্যা ছিল তাঁর নাম লক্ষ্মীমণি। প্রিয় শিষ্য মনোহরের সঙ্গে তিনি কন্যার বিবাহ দেন। তাঁর ভাই গদাধরও তাঁর সঙ্গে হরফ শিল্পের কাজ করতেন। পঞ্চানন সকলকেই হরফ খোদাই ও ঢালাই এর কাজ শেখান, কিন্তু নিজের সমস্ত জ্ঞান ও দক্ষতা দিয়ে যান মনোহরকে। তিনি পরে হরফ শিল্পের যেমন উৎকর্ষতা বাড়ান তেমনি এই শিল্পের ক্ষেত্রও প্রসার করেন।

শ্রীরামপুর মুদ্রণ শিল্পের প্রথম চার বছরের উন্নতি ও প্রসার হয় বিস্ময়কর। এই সময় কলকাতায় অনেকগুলি প্রেস ও হরফ নির্মাণ কেন্দ্র ছিল, কিন্তু শ্রীরামপুরের উন্নতির সঙ্গে কেউ তাল রাখতে পারেনি। ১৮০০ সালের ১৫ আগষ্ট ওয়ার্ড তাঁর দিনলিপিতে লেখেন, "বাংলায় নিউটেস্টামেন্টের ম্যাথু ও মার্ক পুরো এবং লুকের অনেকখানি অংশ ছাপা হয়ে গেছে। নিউটেষ্টামেন্টের সমস্তটা ছেপে ফেলার জন্য খুব পরিশ্রম করছি। আশাকরি ১৮০১-এর মে মাসের মধ্যে শেষ করতে পারবো।"[৪] একটি মাত্র প্রেসের সাহায্যে ব্যবসায়িক কাজের সঙ্গে বাংলা বাইবেল ছাপার কাজ যে দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন হয় তা সেযুগের পক্ষে বিস্ময়কর। প্রয়োজনীয় সব হরফ সরবরাহ করে যান পঞ্চানন। পরিকল্পনামত শ্রীরামপুর হরফের গুণগত মান যেমন উঁচু রাখা হয় তেমনি খরচও রাখা হয় সীমিত। শ্রীরামপুর মিশনের ইতিহাস থেকে জানা যায়, যে তাদের টাইপ ফাউন্ড্রীর খরচ আর লন্ডনের ফাউন্ড্রীর খরচের তফাৎ প্রায় দুহাজার পাউন্ড। শ্রীরামপুরে হরফ ঢালাই এর খরচের চেয়ে লন্ডনের খরচ সাত গুণ বেশি। অথচ এখানকার কাজ লন্ডনের চেয়ে খারাপ নয়।"[৫] ফুলারকে লেখা কেরীর চিঠি থেকে জানা যায়, "শ্রীরামপুরে হরফ ঢালাই সমেত এক পাতা ছাপতে এক আনা খরচ হয়।"[৬] শ্রীরামপুর ত্রয়ীর প্রধান কেরী যোগান মুদ্রণের বিষয়বস্তু,[৭] পঞ্চানন দেন হরফ আর ওয়ার্ড করেন মুদ্রণ। ফলে দেখা যায় ৬০০ পাতার বই এর ২০০০ কপি ছাপতে প্রতিকপির জন্য পড়ে ৩ টাকা; খরচের তুলনায় ছাপা হয় কিন্তু ভালো। এইজন্যই শ্রীরামপুর মুদ্রণের

হয় দ্রুত উন্নতি।

সততা, নির্ভরশীলতা ও সুমুদ্রণের জন্য শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের জনপ্রিয়তা ভারতের চর্তুদিকে ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন ভাষায় মুদ্রণের প্রয়াস এখানে শুরু হওয়ায় শ্রীরামপুরের প্রতি সকলের আগ্রহও বাড়ে। ১৮০৩ সালের মধ্যেই প্রেসের হয় সম্প্রসারণ এবং কর্মীর সংখ্যা হয় বাইশজন। ইংলন্ড থেকে অনেক যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য আনানো হয়। এখানকার দেশীয় কর্মীদের দিয়েও তৈরি করা হয় অনেক যন্ত্রাংশ। লন্ডন ব্যাপটিষ্ট মিশনারী সোসাইটির বিবরণে পাওয়া যায় প্রতিবছর শ্রীরামপুর প্রেসের জন্য অর্থের অনুমোদনের পরিমাণ।১৮০০ থেকে ১৮০৮ রে মধ্যে এই অনুমোদন ছিল নিম্নরূপ ঃ[৮]

শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের জন্য বি এম এস এর অর্থ বরাদ্দ
(১৮০০-১৮০৮)

বছর	বিষয়	অর্থের পরিমাণ পাঃ শিঃ পে
১৮০০-০১	টাইপ, যন্ত্রাংশ ইত্যাদি	১৬৯-১৩-৬
১৮০১-০৩	—	—
১৮০৩-০৪	যন্ত্রাংশ ও অন্যান্য উপাদান	৭৫০-১৯-৮
১৮০৪-০৫	—	—
১৮০৫-০৬	ফার্সী ও অন্যান্য টাইপ, যন্ত্রাংশ	২৯১-১০-০
১৮০৬-০৭	গ্রীক টাইপ, বিভিন্ন উপাদান	৬৩৫-৫-৩
১৮০৭-০৮	ছাপার যন্ত্র গ্রীক টাইপ ও অন্যান্য	৫২১-৩-৫

এছাড়া বাইবেল অনুবাদ ছাপার জন্য আবেদন করে শ্রীরামপুর মিশন বৃটেন, আমেরিকা ও ভারতের ধর্মানুরাগীদের কাছ থেকে অনেক দান ও সাহায্য পান। খুবই পরিতাপের বিষয় দেশীয় যন্ত্রবিদ ও মিস্ত্রী দিয়ে তাঁরা যে সব যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ তৈরি করান তার কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। বিদেশ থেকে আনানো ও এখানকার তৈরি যন্ত্রপাতি যে বিশেষ উপযোগী হয় তা বোঝা যায় মিশন প্রেসের দ্রুত উন্নতি দেখে।

মিশন প্রেসের কাজ (ব্যবসায়িক নয়) সম্বন্ধে বিবরণ প্রকাশ হতে

শুরু হয় ১৮০৬-০৭ সাল থেকে অর্থাৎ পঞ্চানন মারা যাবার পর। প্রতি বছর শ্রীরামপুর মিশন থেকে মেময়ার্স অফ ট্রানস্লেশন নামে যে পুস্তক প্রকাশিত হয়, তাতে বাইবেল অনুবাদের সংবাদের সঙ্গে মুদ্রণ ও হরফ নির্মাণেরও কিছু কিছু খবর থাকত। কিন্তু শিল্পীদের কোন পরিচয় এতে পাওয়া যায় না। তবু পঞ্চানন সম্বন্ধে কিছু কিছু উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন, "পঞ্চাননের সাহায্যে আমরা একটি হরফ ঢালাইখানা গড়ে তুলি।"[৯]

শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের দ্রুত উন্নতি কলকাতার ব্যবসায়ী মহলে বিশেষ চাঞ্চল্য আনে। কলকাতায় মুদ্রণ শিল্প দ্রুত প্রসারিত হয়, কিন্তু দক্ষ দেশীয় কর্মী গোষ্ঠী গড়ে তুলতে না পারায় কাজের মান ও পরিমাণে শ্রীরামপুরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় কেউই বিশেষ সফল হয় না। পঞ্চাননের মত প্রতিভাশালী হরফ শিল্পী না থাকায় কলকাতায় হরফ শিল্পও বিশেষ প্রসার লাভ করে নি। কলকাতার প্রেসগুলি মুদ্রণের সব উপাদান ইউরোপ থেকে আমদানী করত। ফলে মুদ্রণ ব্যয়ও শ্রীরামপুরের তুলনায় কলকাতায় বেশি পড়ত। তবু শ্রীরামপুরের মুদ্রণ কলকাতার মুদ্রণ শিল্পে অনেক গতিশীলতা এনে দেয়।

পঞ্চানন হয়ত অনুভব করেছিলেন পৃথিবীতে তাঁর দিন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। নাতি (কৃষ্ণচন্দ্র) তাঁর প্রশিক্ষণ পাবার সুযোগ পাবে না। তাই জামাতা মনোহরকে তাঁর শিক্ষা উজার করে দিয়ে যান। হাতে ধরে মনোহরকে হরফ খোদাই, ছাঁচ তোলা, ঢালাই প্রভৃতি কাজ শেখান ও তার সুপ্ত প্রতিভাকে উদ্দীপ্ত করে তোলেন। মনোহরের বিনম্র ব্যবহার, শিল্প নৈপুণ্য ও অসাধারণ পরিশ্রম করার ক্ষমতার জন্যই তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল শিষ্যের মধ্যে সব গুণ সঞ্চালিত করা। পঞ্চানন তাঁর অর্জিত সম্পত্তিও দিয়ে যান কন্যা লক্ষ্মীমণি ও জামাতা মনোহরকে। জামাই মনোহর ছাড়া, ভাই গদাধর ও অন্যান্য সহকর্মীদেরও তিনি শিল্পটি ভালোভাবে শিখিয়ে দেন। গদাধরের বংশধরেরা পরবর্তিকালে দীর্ঘ দিন ধরে এই শিল্পটিকে বজায় রাখে। অকাল মৃত্যুর জন্য পঞ্চানন মিশন প্রেসের সৌভাগ্য রবির উদয়ই শুধু দেখে যান, কিন্তু তার ভাস্বরতা যে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে তা দেখে যাবার সুযোগ তিনি পাননি। অল্প সময়ের মধ্যে পঞ্চানন বাংলা হরফের অনেক উন্নতি করেন। হ্যালহেডের সময়ে প্রস্তুত হরফের চেয়ে এই সময়ে প্রস্তুত হরফের আকার যেমন ছোট হয় তেমনি অক্ষরের ছাঁদ হয় সুন্দর,

স্পষ্টতা অনেক বাড়ে। বাংলা হরফের সঙ্গে তিনি একসেট দেবনাগরী হরফ খোদাই করেন। তাছাড়া মারাঠি ও ওড়িয়া ভাষার হরফ তৈরি শুরু করেছিলেন। কিন্তু শেষ করে যেতে পারেন নি। কর্মরত অবস্থাতেই তিনি অকালে পৃথিবীর মায়া ছেড়ে চলে যান। কন্যা লক্ষ্মীমণি, জামাতা মনোহর ও দৌহিত্র কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে শোকে সমব্যথী হন মিশনারীরা ও পঞ্চাননের ছাত্রবৃন্দ এবং বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয় স্বজন সকলে।

শ্রীরামপুর মিশন প্রেস ও হরফ নির্মাণ কেন্দ্রের কোন কার্য বিবরণী পাওয়া যায় না। অনুমান করা যায় প্রাথমিক পর্যায়ের রেকর্ডও ১৮১২ সালের অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হয় এবং পরবর্তিকালে প্রেস হস্তান্তরের সময় প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র সংরক্ষণের চেষ্টা হয়নি। কিন্তু সৌভাগ্য ক্রমে পঞ্চাননের জীবিতকালে মিশন পরিবারের যে পারিবারিক হিসাব খাতা ছিল তা উদ্ধার করে সংরক্ষিত হয়েছে। এই হিসাব খাতায় শুধু পারিবারিক ব্যয়ই নয়, মুদ্রণ ও হরফ তৈরির ব্যয়ের হিসাবও দেওয়া আছে। এই হিসাব খাতা (১৮০০-১৮০৩) পঞ্চাননের নামের উল্লেখ অনেক জায়গায় করেছে। কিন্তু অন্যান্য কর্মীদের নাম পাওয়া যায় না। তবে মুদ্রণ কর্মীদের মাসিক বেতনের চিত্র এখান থেকে পাওয়া যায়। হরফ নির্মাণে ও হরফ নির্মাণের প্রয়োজনীয় উপাদানের জন্য পঞ্চাননকে দেয় অর্থের হিসাব পাওয়া যায়। নিম্নের সারণীগুলিতে এই হিসাবের একটি চিত্র প্রদত্ত হল ঃ[১০]

পারশ্রমিক হিসাবে পঞ্চানন পেয়েছেন

সাল	মাস	মোট পরিমাণ টাঃ -আ- পা	গড় মাসিক টা-আ-পা
১৮০০	৮	১৭৩-৬-০	২১-১০-০
১৮০১	১২	৪৪৩-২-০	৩৬-১৫-০
১৮০২	১২	১১৪২-০-০	৯৫-২-০
১৮০৩	৯	৪৫০-০-০	৫০-১৪-০

এই হিসাবে থেকে দেখা যায় পঞ্চানন মিশনের বেতন ভোগী কর্মচারী ছিলেন না। তিনি কাজ অনুযায়ী পারিশ্রমিক পেতেন। হিসাবের খাতায় আর কিছু লেখা না থাকায় বোঝা যায় না, পারিশ্রমিক তাঁর একার না সহকারীদের সমতে, কিংবা হরফ বা ছাঁচের সংখ্যানুযায়ী টাকা দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় সারণী
হরফ নির্মাণ খাতে প্রদত্ত অর্থ
(কালানুযায়ী)

বছর	তারিখ	কাজের জন্য	উপাদানের জন্য	টা-আ-পা
১৮০০	১ মে	৪০-০-০	—	—
	৭ মে	৭-০-০	—	—
	৬ সেপ্টেম্বর	১২৬-৬-০য়	—	—
১৮০১	৩১ জানুয়ারি	—	পাঞ্জ, ছাঁচ, ব্লক	৭১-৪-০
	৩ ফেব্রুয়ারি	—	ছাঁচ	৭-১২-০
	১২ মার্চ	—	সীসা	২০-০-০
	১৪ এপ্রিল	৩৪-৮-০	—	—
	১২ মে	১৭৫-২-০	—	—
	৩০ জুন	১৩৩-৮-০	—	—
	৩১ জুলাই	—	সীসা, পাঞ্চ	৮২-০-০
	২৮ নভেম্বর	১০০-০-০	—	—
১৮০২	৫ এপ্রিল	৫৮-০-০	—	—
	২৬ এপ্রিল	১০০-০-০	—	—
	২৪ জুন	৫৬-০-০	—	—
	৩০ জুলাই	১০০-০-০	—	—
১৮০২	৩ আগস্ট	১০০-০-০	—	—
	২ সেপ্টেম্বর	১০০-০-০	—	—
	২৭ সেপ্টেম্বর	৩৫১-০-০	—	—
	২১ অক্টোবর	—	সীসা	৪০-০-০
	৩০ নভেম্বর	২৫০-০-০	—	—
	১ ডিসেম্বর	৩২-০-০	—	—
১৮০৩	১ জানুয়ারি	৬৪-০-০	—	—
	১ মার্চ	২০৬-০-০	—	—
	৪ জুন	১২-০-০	—	—
	১ জুলাই	১৫৬-০-০	—	—
	১ সেপ্টেম্বর	২০-০-০	—	—

তৃতীয় সারণী
ছাপাখানা, বাঁধাই ও অন্যান্য কর্মীদের পারিশ্রমিক
(১৮০০-১৮০১)

সাল	মাস	ছাপাখানার কর্মী সংখ্যা	পারিশ্রমিক টা-আ-পা	বাঁধাই ও অন্যান্য কর্মী	পারিশ্রমিক টা-আ-পা
১৮০০	জুন	৬	৪২-০-০	৫	২৫-৩-৯
	আগস্ট	৪	৩২-০-০	৫	২৮-৮-০
	অক্টোবর	৪	৩২-০-০	৫	২৮-১০-০
১৮০১	জানুয়ারি	৬	৪৪-১৫-১১	৮	৩৭-১-৬
	ফেব্রুয়ারি	৫	৩৮-১৫-০	৫	২৪-৮-০
	মার্চ	৬	৪২-১১-০	৬	২৭-১০-০
	এপ্রিল	৬	৪৫-৮-০	৬	২৯-১০-০
	মে	৯	৬৪-০-০০	৬	৩৬-০-০
	জুন	৯	৬২-০-০	৬	২৯-০-০
	জুলাই	৮	৫৬-০-০	৭	৩৩-০-০
	আগষ্ট	৮	৬১-১৩-০	৭	৩২-৩-১০
	সেপ্টেম্বর	৮	৬০-১-৩	৭	৩৫-৭-৯
	অক্টোবর	১০	৬৮-০-০	৫	২৬-৪-০
	নভেম্বর	১১	৭৮-১০-০	৫	২৩-৩-৬
	ডিসেম্বর	৯	৬৭-১২-০	৫	২২-৮-০

এদেশে কুশলী শ্রমজীবিদের পারিশ্রমিকের হারের সল্পতার জন্যই কেরী এদেশে বৃটিশ যন্ত্রপাতি ও দেশীয় শ্রমের সাহায্যে আধুনিক শিল্প স্থাপনে অগ্রণী হন। প্রযুক্তিবিদ্ শিল্পীদের প্রতিভার উৎকর্ষতা তাঁকে বিশেষভঅবে অনুপ্রেরিত করে। বিশেষ করে পঞ্চাননের মত দক্ষ শিল্পী ও শিল্প শিক্ষকের পারিশ্রমিক ছিল এতে, অল্প যে তার সঙ্গে ইংরেজ শিল্পীদের তুলনা করা চলে না। এঁরা পারিশ্রমিক নিয়মিত বেতন হিসাবে পেতেন বলে মনে হয় না। ছাপাখানা, বাঁধাই এর কাজ, হরফ নির্মাণ কেন্দ্রের কর্মীরা কাজের বিনিময়ে অথবা দৈনিক কিংবা সাপ্তাহিক হিসাবে পারিশ্রমিক পেতেন। তাই তাঁদের অর্থপ্রাপ্তির তারতম্য দেখা যায়। ছাপাখানার কর্মীরা প্রত্যেকে গড়ে মাসিক উপার্জন করত সাড়ে সাত

টাকা এবং বাঁধাই ও অন্যান্য কর্মীরা পেতেন পাঁচ টাকা। নতুন সম্ভাবনাময় শিল্পের গৌরবময় অধ্যায়ের সূচনা করে এই "অর্ধসভ্য" (উইলকিন্সের ভাষায়) হরফ শিল্পী পঞ্চানন কর্মকার যখন ধরাধাম থেকে বিদায় নেন তখন শ্রীরামপুরের মিশনারীরা ছাড়া আর কেউই উপলব্ধি করতে পারে নি ভারতের কি অপূরণীয় ক্ষতি হল।

উল্লেখ পঞ্জী

১. Serampore Mission : Household Accounts I (MSS) 1800

২. Ward Wm. : Journal (MSS) I August 1800

৩. Serampore Mission : Ist Memoir of Translation 1807

৪. Ward Wm. : Jounal (MSS) I 15th Aug, 1800

৫. Marshman J.C. : History of serampore Mission Vol. I P. 30

৬. Carey William : Letter to Fuller 1804

৭. Ward Wm. : Journal (MSS) 12th september, 1803

৮. BMS : P.A.

৯. Serampore Mission : 1st Memoir of translation 1807

১০. Serampore Mission : Household Accounts I. II (MSS) 1801-1803

৬

শ্রীরামপুর হরফ শিল্পের উন্নতি ও প্রসার : মনোহর কর্মকারের প্রতিভার বিকাশ

পঞ্চাননের তিরোধানের পর শ্রীরামপুর হরফ শিল্পের দায়িত্ব মনোহর এমন নিপুণ হাতে গ্রহণ করেন যে এই শিল্পের অগ্রগতি অব্যাহত থাকে এবং শিল্পটি দ্রুতহারে প্রসার লাভ করে। ১৮০৪ সাল থেকে শুরু হয় শ্রীরামপুর হরফ শিল্পের দ্বিতীয় পর্ব। অধিনায়কত্ব করেন পঞ্চাননের প্রিয়শিষ্য ও সার্থক উত্তর সাধক মনোহর কর্মকার। এই সময় থেকে বাংলা ছাড়া আরও চারটি প্রাচ্যভাষায় ছাপার কাজ শুরু হয়। ১৮০৪ সালের ৪ঠা এপ্রিলে লেখা একটি চিঠিতে মিশনারীরা লেখেন, "আমরা ভেবেছিলুম ছোট ছোট অংশে বাংলা বাইবেল প্রকাশ করব। কিন্তু এখন এক সঙ্গে পুরো নিউটেস্টামেন্টাই ছাপছি। হিসেব করে দেখেছি ১০০০ কপি এন টি যে কোন ভারতীয় ভাষায় ছাপতে খরচ পড়বে ৫০০০ টাকা এবং সময় লাগবে এক বছর। আমরা এখন বাংলা সমেত পাঁচটি ভাষায় কাজ শুরু করেছি।"[১] ফুলারকে লেখা চিঠিতে (১৮০৪) কেরী বলেন, "এখন বাইবেলের বাংলা অনুবাদ (২য় সংস্করণ) সংশোধন করছি। তাছাড়া কাজ শুরু করছি হিন্দি, ফার্সী মারাঠি ও ওড়িয়া ভাষায়। আরও ভাষায় কাজ শুরু করার ইচ্ছা আছে।"[২] পঞ্চানন মারা যাবার আগে ফার্সী ছাড়া আর সব ভাষার (অর্থাৎ হিন্দি, মারাঠি ও ওড়িয়া) হরফ তৈরির কাজ শুরু করেন। তিনি যে দেবনাগরী হরফ কাটার কাজ শুরু করেন তা হিন্দি ও সংস্কৃত ভাষার জন্য। মনোহর ছিলেন এই কাজে তাঁর প্রধান সহকারী এবং শিষ্য। তাই পঞ্চাননের অসমাপ্ত কাজ শেষ করা তাঁর পক্ষে সহজ সাধ্য হয়। এই কাজ শেষ করার পর তিনি

নতুন হরফ তৈরি করার কাজে মন দেন। মনোহরের কাজ সম্বন্ধে বলা হয়েছে, 'বাংলা, নাগরী, আরবি, ফার্সী, এবং অন্যান্য ভারতীয় ভাষার হরফের জন্য বাংলা দেশ মনোহরের কাছে বিশেষভাবে ঋণী। ভারতের বিভিন্ন প্রেসে মনোহরের তৈরি হরফ ব্যবহৃত হত।"[৩] মনোহর হরফ শিল্পে নতুন প্রাণ সঞ্চার করেন। তিনি সহকারী বহু কর্মীকেও হরফ তৈরির কাজ শেখান।

খুবই পরিতাপের বিষয় প্রতিভাশালী হরফ শিল্পী মনোহর কর্মকার সম্বন্ধে বিস্তারিত কোন তথ্যই আমরা সংগ্রহ করতে পারিনি। শ্রীরামপুরের মিশনারীরা যখন ছাপার কাজ শুরু করেন তখন দেশীয় কর্মীদের বিশেষ করে পঞ্চাননের বিভিন্ন বিবরণে প্রশংসাসূচক মন্তব্যের সঙ্গে নাম উল্লেখ করেন। কিন্তু পরবর্তীকালে যখন তাঁদের ছাপাখানা স্থায়ী ও উন্নত হয়, তখন তাঁরা এঁদের সম্পর্কে আশ্চর্যজনকভাবে নীরব থাকেন। অথচ শ্রীরামপুর প্রেসের গৌরবজনক অবদানের জন্য সবচেয়ে বেশি কৃতিত্ব হরফ শিল্পী মনোহর কর্মকার ও তাঁর সহকর্মীবৃন্দের। মনোহর সম্বন্ধে যেটুকু সংবাদ জানা যায় তাতে দেখা গেছে তিনি ত্রিবেনীর অধিবাসী ছিলেন। তাঁর পিতা ও তাঁর পরিবারের পূর্ব ইতিহাস কিছু জানা যায় না।[৪] শুধু জানা যায় পঞ্চানন তাঁকে শ্রীরামপুর হরফ ঢালাইখানার কাজের জন্য নিয়ে আসেন। মনোহরের নিয়োগ সম্বন্ধে পরবর্তীকালে (১৮৫৯) জন ক্লার্ক মার্শম্যান লিখেছেন, "To accelerate the progress of the work, Panchanan was advised to take an assistant, and a youth of the same caste and craft, of the name of Monohar, an expert and elegant workman, who was subsequently employed for forty years at the Serampore press and to whose exertions and instructions Bengal is indebted for the various beautiful founts of the Bengalee, Nugree, Persian, Arabic and other characters which have been gradually introduced into the different printing establishments."[৫]

মনোহরকে পঞ্চানন শ্রীরামপুরে নিয়ে আসার পর তাঁর কাজ দেখে মুগ্ধ হন এবং একমাত্র কন্যা লক্ষ্মীমণির সঙ্গে তাঁর বিয়ে দিয়ে শ্রীরামপুরে নিজের গৃহেই তাঁকে স্থিতু করেন। কারণ পঞ্চাননের কোন পুত্র সন্তান ছিল না। এবং লক্ষ্মীমণি ছিল তাঁর একমাত্র কন্যা ও উত্তরাধিকারীনি। এই বিবাহ

হয় সম্ভবতঃ পঞ্চানন শ্রীরামপুরে আসার পর। প্রয়াত হবার আগেই তিনি মেয়ে জামাইকে শ্রীরামপুরে প্রতিষ্ঠিত করেন। এবং মনে হয় পৌত্রের (কৃষ্ণচন্দ্র) মুখ দর্শন করে যান।

১৮০৪ থেকে ১৮১২র মধ্যে শ্রীরামপুর মুদ্রণের প্রসার ও উন্নতি বিস্ময়করভাবে দ্রুত হারে হয়। এরজন্য কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন প্রধানতঃ উইলিয়াম ওয়ার্ড ও তাঁর দেশীয় সহকারীবৃন্দ, কারণ এই সময়ে ওয়ার্ড ছাড়া ইংলন্ডে শিক্ষা প্রাপ্ত মুদ্রণ ও হরফ শিল্পে সুদক্ষ প্রযুক্তিবিদ্ কর্মী শ্রীরামপুরে ছিল না। ওয়ার্ড ফেলিকস্ কেরী ও ব্লান্সডনকে মুদ্রণের কাজ শেখান। কিন্তু ব্রান্সডন অকালে মারা যান এবং ফেলিকস্ শ্রীরামপুর ছেড়ে ব্রহ্মদেশে চলে যান। নবাগত মিশনারী জশুয়া রো ওয়ার্ডের সহকারি হন। কিন্তু মুদ্রণ সম্পর্কিত কোন কাজে তাঁর জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা ছিল না। দক্ষ ও কুশলী দেশীয় কর্মী বৃন্দ (ইউরোপীয় প্রশিক্ষণের সহায়তা ছাড়াই) মুদ্রণ ও তৎসংক্রান্ত শিল্প সমূহের দ্রুত উন্নতি ঘটায়। হরফ শিল্পের উন্নতি ও প্রসারের সব কৃতিত্বই মনোহর ও তাঁর সহকারীবৃন্দের। এঁদের হাতেই শ্রীরামপুরে গড়ে ওঠে এশিয়ার শ্রেষ্ঠ টাইপ ফাউন্ড্রী। আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন হরফ নির্মাণ বিশেষজ্ঞ ট্যালবট বেইন্স্ বলেছেন, ''The Baptist Mission at Serampore, under the leadership of William Carey, was very active in cutting types and printing books in various Indian languages in the early part of the nineteenth century. All these types were the work of the missionaries or of native craftsmen trained by them, with little or no technical help from England, the total represents a remarkable achievement in the history of type cutting.''[৬]

ভারতীয় প্রতিভা সম্বন্ধে কোন ধারণা না থাকায় বেইন্স্ বলেছেন মিশনারীদের দ্বারা প্রশিক্ষিত দেশীয় কর্মীরা এই কৃতিত্বপূর্ণ কাজ করেন। কিন্তু ১৮১২ সালের আগে শ্রীরামপুরে যে মিশনারীরা এসেছিলেন তাঁদের কেউই হরফ খোদাই এর কাজ জানতেন না।[৭] এই হরফ শিল্পের উন্নতির জন্য সমস্ত কৃতিত্ব মনোহর ও তাঁর সহকারীবৃদের প্রাপ্য।

১৮০৭ সালে 'প্রথম মেময়ার্স অফ্ ট্রানস্লেশনে' শ্রীরামপুরের মিশনারীরা লেখেন, ''By his (panchanan's) assistance we created a letter foundry; and although he is now dead, he had so fully communicated his art to a number of others, that they

carry forward the work of type casting, and even of cutting the matrics, with a degree of accuracy which would not disgrace European artists.''[৮]

শ্রীরামপুরের মিশনারীরা স্বীকার করেছেন যে দেশীয় কর্মীরা পঞ্চাননের দ্বারা প্রশিক্ষিত হয়েছিলেন তাঁদের দ্বারা নয়। দেশীয় কর্মীদের প্রধান ছিলেন মনোহর। ১৮০৭ সালের বিবরণ থেকে জানা যায় ঐ সময় মনোহর তিন প্রস্থ বাংলা, এক প্রস্থ দেবনাগরী, নতুন একপ্রস্থ ওড়িয়া, মারাঠি প্রভৃতি হরফ তৈরি ছাড়া কেরীর প্রয়োজনানুযায়ী বর্মী, তেলুগু ও পাঞ্জাবী হরফ তৈরির কাজ করেছে।[৯] তাছাড়া অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় হরফের সঙ্গে মনে হয় চীনা ভাষারও ধাতব সচল হরফ প্রস্তুত করেন। পরবর্তী অধ্যায়ে বিষয়টি সম্বন্ধে আলোচিত হবে।

এই সময় মুদ্রণ শিল্পের যে প্রসার হয় তার চিত্র পাওয়া যায় বিভিন্ন বিবরণ থেকে। মুদ্রণ শিল্পের উন্নতির মূলে ছিল সম্পূর্ণ দেশীয় কর্মীদের দ্বারা পরিচালিত হরফ শিল্প। ওয়ার্ডের বিবরণ থেকে পাওয়া যায় এই শিল্পের একটি অভ্যন্তরীণ চিত্র। ১৮০৭ সালে ওয়ার্ড লেখেন, "শ্রীরামপুর প্রেসে এখন চারটে বড় বড় মেশিন ১৭০ ফুট লম্বা এবং ৪৫ ফুট চওড়া হল ঘরে বসানো হয়েছে। প্রেসে ঢুকেই দেখতে পাবে তোমার ভাই (ওয়ার্ড) একটি ঘরে বসে আছে, ঘরটি তার অফিস ঘর, সাদা জ্যাকেট পরে বসে কিছু পড়ছে বা লিখছে, আর হল ঘরে ছাপার কাজের দিকে নজর রাখছে। হল ঘরে এলে দেখবে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার পণ্ডিতেরা হয় অনুবাদের কাজ করছেন বা সংশোধনের কাজ করছেন। সেখানে দেখবে নানা বাক্সে থরে থরে সাজানো আছে বাংলা, দেবনাগরী, মারাঠি, ওড়িয়া, পাঞ্জাবী, আরবি, ফার্সী, তেলুগু, বার্মিজ, গ্রীক, হিব্রু, ইংরাজী প্রভৃতি ভাষার হরফসমূহ। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান কর্মীদের দেখবে খুব ব্যস্ত রয়েছে হরফ সাজাতে, ছাপার আর অন্যান্য হরেকরকম কাজে। চারজন কর্মীকে দেখবে কাগজগুলি ভাঁজ করে সাজাতে আর সাজানো কাগজ গুদামে নিয়ে যাচ্ছে দু'জন লোক। সেখানে আছে ৬জন বাঁধাই কারক, তারা সাজানো পাতাগুলিকে বই করে বাঁধায়। প্রেস ঘরের বাইরে এসে দেখবে কিছু দূরে রয়েছে হরফ তৈরির কারখানা। সেখানকার কর্মীরা হরফের ছাঁচ তৈরি, হরফ ঢালাই প্রভৃতি কাজে ব্যস্ত। সেখানে আর এক ধারে তৈরি হচ্ছে ছাপার কালী। প্রেস থেকে খানিকটা দূরে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা জায়গায় আছে আমাদের কাগজের কল। কাগজ সমেত আমরা

ছাপার সব জিনিসই তৈরি করি।"[১০]

মিশনের ছাপাখানা, হরফ তৈরির কারখানা, কাগজ ও কালী তৈরির কাজে প্রভৃতিতে বহু দেশীয় কর্মী যোগদান করেন এবং তাঁদের প্রতিভা স্ফুরণের পান অবারিত সুযোগ। তবু তাঁদের পারিশ্রমিক ছিল খুব অল্প। জন প্রতি গড়ে মাসিক ৫ থেকে ৮ টাকার মধ্যে। কিন্তু যেহেতু দেশীয় কর্মীদের সরল জীবনযাত্রার জন্য চাহিদা ছিল অল্প, তাই ঐ সল্প আয়েই তাঁরা সন্তুষ্ট ছিলেন বলে মনে হয়। এছাড়া বিভিন্ন ভাষাভাষী বহু পণ্ডিত ও কর্মী মিশনের অনুবাদ ও মুদ্রণের কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। হিন্দি ভাষায় ব্যুৎপত্তি সম্পন্ন জনৈক বর্মী পরিব্রাজক বর্মী ভাষায় অনুবাদ ও বর্মী হরফ তৈরির কাজে সাহায্য করেন। চীনা কারিগরেরা ছিলেন চীনা হরফ তৈরিতে সাহায্য করতে। একজন ইহুদী পণ্ডিত ছিলেন আরবী, ফার্সী, সিরীয় ও হিব্রু ভাষা শেখানোর জন্য।[১১] বহু ভাষাবিদ পণ্ডিত উইলিয়াম কেরীর নেতৃত্বে বহু ভাষা সমন্বয়ের ক্ষেত্র গড়ে ওঠে শ্রীরামপুরে।

হরফের শৈল্পিক সুষমা, স্পষ্টতা ও বোধগম্যতা মনোহরের হাতে বিস্ময়করভাবে উন্নত হয়। তিনি হরফের গঠন, সজ্জা শৃঙ্খলা, সমরৈখিকতা, কালীর সমানুপাতিক বিভাজন, অক্ষর সমূহের মধ্যে সমানুপাতিক ফাঁক—এক কথায় সামগ্রিক হরফ সংগঠনের এক অনুকরণীয় আদর্শ স্থাপন করেন। ১৮০৭ সালের বিবরণ উদ্ধৃত করে জর্জ স্মিথ লিখেছেন, "(Bengali type) was most of the kind in India."[১২] ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সরকারি তথ্য থেকে জানা যায় পঞ্চানন ও মনোহর শব্দের আদি, মধ্য এবং অন্তে ব্যবহৃত স্বর ও ব্যঞ্জন চিহ্নগুলি পৃথকভাবে কাটেন, ফলে অক্ষরের সাথে তাদের ব্যবধান থাকত অনেক। পরে নিপুণ কর্তন ও ঢালাই এর সাহায্যে এই ব্যবধান এমনভাবে কমিয়ে আনেন যে ছাপার ও লেখার মধ্যে আর কোন ব্যবধান থাকে না।

১৮০৭ সালে বাইবেল অনুবাদ, মুদ্রণ ও হরফ উৎপাদন কিরূপ ছিল তার একটি চিত্র পাওয়া যায় নিম্নের তালিকায় ঃ[১৩]

ভাষা	অনুবাদ	মুদ্রণ	হরফ তৈরি
বাংলা	নিউ ও ওল্ড টেষ্টামেন্ট	এন টি(২সং) এন টি অংশ	নতুন সেট
ওড়িয়া	এন, টি	১০০০ এন, টি	এক সেট
মারাঠি	এন, টির অংশ	গস্‌পেল অফ্ ম্যাথুজ	এক সেট
তেলুগু	এন, টি	—	হরফ তৈরি শুরু

কানাড়া	এন, টি	—	..
গুজরাটি	..	প্রথম অংশ(নাগরী হরফ)	—
হিন্দুস্থানী	..	..	—
পাঞ্জাবী	..	—	—
সংস্কৃত	..	এন. টি	এক সেট
চীনা	..	—	হরফ তৈরি শুরু
ফার্সী	..	—	—
বার্মিজ	..	—	হরফ তৈরি শুরু

হরফ তৈরির পর্যায়ে ক্রম বিস্তার বোঝা যায় প্রদত্ত সারণী থেকে। অনুবাদ শেষ হলে শুরু হয় হরফ তৈরি ও মুদ্রণ। অনুবাদ শুরু হবার পরেই মনোহর সেই ভাষার হরফ তৈরি শুরু করেন এবং অনুবাদ শেষ হবার আগেই হরফ তৈরি শেষ করেন। কুশলী হস্তাক্ষরবিদকে নিযুক্ত করা হয়। তিনি হরফের নমুমা সুন্দর করে লিখে দেন, মনোহর তাকে অনুসরণ করে নতুন হরফ তৈরি করেন। প্রাচ্য ভাষার হরফ তৈরি করতে মনোহর অসামান্য কৃতিত্ব দেখান।

উল্লেখপঞ্জী

১. Serampore Mission : Periodical Accounts II P. 483
২. Carey William : Letter to Fuller July 1804
৩. Serampore Missionaries : Letter to BMS 1807
৪. চট্টোপাধ্যায় সবিতা ঃ বাংলা সাহিত্যে ইউরোপীয় লেখক, পৃঃ ১৪২
৫. Marshman J. C : Life and Times of Carey, Marshman and Ward Vol. I p. 127
৬. Johnson : History of the old English Letters p. 20
৭. B.M.S. Periodical Accounts 1793-1812, Memories of serampore Translations, Journals of Carey, Marshman, Ward বা তাঁদের চিঠিপত্রে কোথাও উল্লেখ নেই যে তাঁদের কেউ হরফ শিল্প জানতেন।
৮. Serampore Mission : 1st Memor of translation 1807
৯. B.M.S. : Periodical Accounts 1807
১০. Carey S.p : William Carey p. 283
১১. Carey s. P. : William Carey P. 260
১২. Smith George : Wm Carey p. 181
১৩. B. M. S. : Periodical Accounts 1807

৭

শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে অগ্নিকাণ্ড ও তার প্রতিক্রিয়া (১৮১২)

হরফের সৌকর্য, বৈচিত্র, স্পষ্টতা, সমরৈখিকতা প্রভৃতি গুণের মানোন্নয়নের জন্য ইউরোপে প্রথানুগ গবেষণা মুদ্রণ সূচনার সময় থেকেই শুরু হয়। এদেশে সে সুযোগ হয়নি। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাতেই এখানে হরফ শিল্পের উন্নতি হয় এবং হরফ শিল্পের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে ওঠে। শ্রীরামপুরের হরফ শিল্পীরা বাহিরের সাহায্য ছাড়াই এই শিল্পের মানোন্নয়ন ও প্রসার করেন। মনোহর বা কৃষ্ণচন্দ্রের গবেষণার ধারা দেশীয় প্রথাগতভাবে হয় এবং তার বিবরণও লিপিবদ্ধ হয়নি। তাই আমরা সে সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারিনি। মুদ্রণের প্রসারের মধ্য থেকেই হরফ শিল্প বিস্তারের রূপটি দেখতে পাওয়া যায়।

প্রযুক্তিবিদ্ বিজ্ঞানী ও কারিগরী শিল্পীদের উপযুক্ত মর্যাদা দান করার কুণ্ঠা আমাদের এখনও কাটেনি, শুধু তত্ত্বাবধান করার জন্য উইলকিন্সকে যে সম্মান আমরা দিই, তার কণা মাত্র পঞ্চানন, মনোহর, কৃষ্ণচন্দ্র প্রমুখ প্রতিভাশালী প্রযুক্তিবিদ্দের দেবার কথা চিন্তা করি না।

১৮০৪ সালে পঞ্চানন বাংলা ছাড়া আরও দু-তিনটি ভাষার (সংস্কৃত, ওড়িয়া, মারাঠি) মাত্র হরফ তৈরি করেন, মনোহরের প্রতিভা ও দক্ষতা বেশি ছিল তা এ থেকেই বোঝা যায়।[১]

বার্মিজ ও চীনা ভাষায় হরফ তৈরির প্রয়াস শ্রীরামপুর মিশন মুদ্রণ শিল্পের পক্ষে বিশেষ তাৎপর্য পূর্ণ ও ঐতিহাসিক ঘটনা। চীনা হরফ অতি জটিল এবং চীন দেশে কাঠের ছাঁচে মুদ্রণ প্রচলিত হলেও সচল ধাতু হরফে ছাপা চীনে প্রচলিত ছিল না। শ্রীরামপুরের মিশনারীরা

প্রথমে চীন দেশের মত কাঠের ছাঁচে ছাপার কথা চিন্তা করেন এবং অনুবাদের বিবরণীতে লেখেন, "চীনা ভাষায় মুদ্রণের কাজ আমাদের কাছে অবাস্তব নয়, শুধু প্রয়োজন ইংলন্ড থেকে একজন কাঠ খোদাই কারকের আসা। ক্যানটন বা পিকিং এর মত আমরা কাঠের ছাঁচে ছাপাতে পারবো।"[২] বর্মী ভাষা সম্বন্ধে সমাচারে আছে, "আমরা বর্মী ভাষার এক ফাউন্ট হরফ করিয়েছি। বার্মায় এখনও ছাপা শুরু হয়নি। কিন্তু ওদের হরফ খুব স্পষ্ট, সুছাঁদ ও সুন্দর। আশাকরি, এই ভাষায় বই ছাপতে খরচ খুব বেশি হবে না।" মনোহরের নাম কোথাও উল্লিখিত না হলেও, বর্মী হরফ যে মনোহরই করেন এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই, কারণ তিনিই তখন হরফ নির্মাণ কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন এবং বিদেশ থেকে হরফ তৈরির জন্য তখনও কোন কারিগর আসেননি।

চীনা পণ্ডিত ও চীনা পর্যটকদের সাহায্যে কিছু কাঠের ব্লক তৈরি করা হয় চীনা ভাষায় ছাপার জন্য এবং তা দিয়ে ছাপাও শুরু হয় কিন্তু মোটেই সন্তোষজনক হয় না এবং দেখা যায় পদ্ধতিটি বেশ সময় ও ব্যয় সাপেক্ষ, ফলে মিশন ব্লক মুদ্রণের প্রয়াস ত্যাগ করেন এবং চেষ্টা করেন সচল ধাতু হরফ তৈরি করার। মনোহরকেই দায়িত্ব নিতে হয় চীনা হরফ তৈরি করার। চীনা হরফের গঠন বৈচিত্র ও জটিলতা অন্যান্য ভাষার তুলনায় অনেক বেশি। এবং মনোহরকে নির্দেশ দেবার মত তখন কেউ শ্রীরামপুরে ছিলেন না। ফলে নিজের চেষ্টায় ও সহকারীদের সাহায্যে মনোহরই এক ফাউন্ট চীনা হরফ তৈরি করেন। অনেকে মনে করেন ইংরেজ শিল্পী জন লসন শ্রীরামপুরে হরফ তৈরি করেন। কিন্তু তা সত্য নয় কারণ জন লসন শ্রীরামপুরে আসেন ১৮১২ সালের মার্চে প্রেসে আগুন লাগার পর।[৩] অথচ আগুনে ক্ষতিগ্রস্থ উপাদানসমূহের মধ্যে ধাতুর চীনা হরফও দেখা যায়। চীনা হরফ প্রেসের আগুনের আগেই কর্তিত হয় এবং মনোহরই তা করেন। মনোহরের এই গৌরবময় কৃতিত্বের কথা কেউই মনে রাখেন নি। শ্রীমতী ভয়েট (জশুয়া ও হানা মার্শম্যানের কন্যা) কর্তৃক অনুলিখিত হানা মার্শম্যানের দিনলিপিতে (অমুদ্রিত) শ্রীরামপুরে চীনা মুদ্রণের সূচনা সম্বন্ধে লেখা আছে যে সে সময় চীনা ভাষায় মুদ্রণ খুব কঠিন ছিল এবং শ্রীরামপুর ছাড়া অন্য কোথাও এই মুদ্রণে সফল হয়নি। দীর্ঘকাল ধরে চীন দেশে যেরূপ প্রচলিত ছিল সেইভাবে কাঠের ব্লকের সাহায্যে কাগজের

একপিঠে গসপেলের পাতা ছাপা হয়। কিন্তু এই কাজে কোন দক্ষ চীনা শিল্পী পাওয়া যায় নি। শ্রীরামপুরে তখন কাপড় ছাপার কারখানা ছিল। মিঃ জশুয়া মার্শম্যান সেখানকার কয়েকজন দেশীয় শিল্পীকে দিয়ে তেঁতুল কাঠের উপযুক্ত ব্লকের ওপর চীনা ভাষা খোদাই করান এবং তাদ্বারা গসপেল অফ ম্যাথুজের দুই অধ্যায় মুদ্রণ করান। মুদ্রিত কয়েকটি পাতা গভর্নর জেনারেল লর্ড মিন্টোকে উপহার দেওয়া হয় (১৮০৭ সালে)। যারা কোন দিন চীন দেশ যায় নি তারা এরূপ চীনা ভাষায় মুদ্রণ করতে পারায় সকলে খুব বিস্মিত হয়। কিন্তু দেখা গেল এভাবে একপাতা ছাপতে অনেক খরচ ও খুব বেশ সময় সাপেক্ষ। তাছাড়া এই প্রণালীতে কিছু সংশোধন করতে হলে পুরো ব্লক ফেলে দিয়ে নতুন ব্লক করার দরকার হয়। সেজন্য এই প্রণালীতে না ছেপে ইউরোপীয় প্রণালীর সচল হরফ ব্যবহার করা হয়। ধাতুর ছোট ঘনক তৈরি করা হল, তার ওপর দক্ষ দেশীয় শিল্পী চীনা হরফ খোদিত করল, এইভাবে সব চীনা হরফ পৃথক পৃথক ঘনকে খোদিত হল। এইগুলি দিয়ে কাঠের ব্লকের পাঁচগুণ বেশি ছাপ দেওয়া যায়। খোদাই করা ঘনক থেকে স্টিল পাঞ্চ তৈরি করা হল যা বহু সংখ্যক হরফ উৎপাদন করল। এই চীনা হরফ নির্মাণ ঐ ভাষার মুদ্রণে বিপ্লবাত্মক উন্নতি করল এবং চীনা সাহিত্যের ইতিহাসে সূচনা করল নতুন যুগের।[৪] ভারতের দেশীয় শিল্পী বলেই পৃথিবীর এই শ্রেষ্ঠ হরফ শিল্পীকে ইতিহাসের পাতা স্থান দেয়নি।

ইউরোপে যাঁরা প্রাচ্য ভাষার হরফ তৈরি করেছেন তাদের নাম মুদ্রণের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। কিন্তু প্রাচ্য ভাষার হরফ সমূহের প্রথম ফাউন্ট তৈরি করা সত্ত্বেও উপেক্ষিত ও অনাদৃত রয়ে গেছেন মনোহর ও তাঁর সহকর্মীরা। মনোহর সম্পর্কে শ্রীরামপুর মিশনের নীরবতাও খুব বিস্ময়কর। কেরীর বহু ভাষায় অনুদিত বাইবেল মুদ্রণ ও প্রচারিত করার সুবৃহৎ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হতে পেরেছে শুধু মনোহরের কর্মদক্ষতার জন্য এ সত্যকে অস্বীকার করার উপায় নেই। মিশনারীরাই অনেক জায়গায় স্বীকার করেছেন দেশীয় শিল্পীদের কাজ ইউরোপীয় শিল্পীর নৈপুণ্যের চেয়ে কম না। মিশনের বিবরণীতে আরও বলা হয়েছে, ওদের (হরফ শিল্পীদের) সাহায্যে নতুন ফাউন্ট এমনভাবে করানো হচ্ছে যাতে কাগজের খরচ কম হয় অথচ অক্ষর ভালোভাবে পড়া যায়। এই হরফের আকারও আগের হরফের এক

চতুর্থাংশ হবে। দেবনাগরীর নতুন ফাউন্ট করানো হয়েছে, এতো সুন্দর হরফ ভারতে আর কোথাও দেখা যায় না। প্রায় হাজার রকম সংযুক্তি হরফ তৈরি হয়েছে এবং শুধু খোদাই এর কাজই পড়েছে ১৫০০ টাকা। ধাতু আর ঢালাই এর খরচ আলাদা।"[৫]

ওড়িয়া, মারাঠি ভাষারও নতুন হরফ তৈরি হয়। ৩০০ রকমের বিভিন্ন হরফ তৈরি করতে খরচ পড়ে ১৫০০ টাকা। চলতি মারাঠি ভাষার হরফ দেবনাগরীর চেয়ে একটু ছোট। হরফগুলি খুব সুন্দর হয়েছে এবং খরচও পড়েছে একই রকম। বর্মী, তেলুগু, মাড়বারী, পাঞ্জাবী প্রভৃতি ভাষায় হরফ তৈরির কাজ অনেকটা এগিয়েছে। একদিকে পুরনো হরফে নতুন ছাঁদ দেওয়া হয়, অপরদিকে নতুন নতুন হরফ তৈরিও হয়। হরফ শিল্পই ছিল শ্রীরামপুর মুদ্রণ শিল্পের প্রাণ। ফার্সী হরফ প্রথম দিকে ইংলন্ড থেকে আনলেও পরে শ্রীরামপুর হরফ শিল্প কেন্দ্র ফার্সী টাইপও প্রস্তুত করে।[৬] শ্রীরামপুর মিশন অনুবাদ সম্পর্কে যে সমাচার প্রচার করে, তাতে হরফ তৈরি, মুদ্রণ, অনুবাদ প্রভৃতির খরচের হিসাব প্রদত্ত হয়। মুদ্রণের খরচই হয় সবচেয়ে বেশি। শুধু বাংলা মুদ্রণের জন্য ১৮০৬ সাল পর্যন্ত খরচ (হরফের খরচ সমেত) হয় ৩৫০০ পাউন্ড।[৭] ১৮১০ সালের মধ্যে ১০টি ভাষায় নিউটেষ্টামেন্ট (চীনা ছাড়া) অনুবাদ ও মুদ্রণের (হরফ তৈরি সমেত) ব্যয় হয় নিম্নরূপ ঃ

(ক) অনুবাদের ব্যয়

পণ্ডিতের সংখ্যা	মাসিক বেতন(প্রত্যেকের)	বার্ষিক ব্যয়	মুদ্রণে বছরে মোট ব্যয়
	টা	টা	টা
১০	২৫.০০	৩০০০.০০	১২০০০.০০

(খ) হরফ সমেত মুদ্রণের ব্যয়

ভাষা	কপি	পৃষ্ঠা	আকার	ব্যয় (টা)
সংস্কৃত	১০০০	৬০০	কোয়ার্টো	৫০০০.০০
হিন্দি	..	৭০০	..	৫৫০০.০০
মারাঠি	..	৮০০	অকটেভো	৪০০০.০০
ওড়িয়া	..	৭০০	..	৩৫০০.০০
গুজরাটি	..	৭০০	কোয়ার্টো	৫৫০০.০০
কানাড়া	..	৯০০	অকটেভো	৪৫০০.০০

তেলেগু	..	৯০০	অকটেভো	৪৫০০.০০
পাঞ্জাবী	..	৭০০	কোয়ার্টো	৫৫০০.০০ বাম
বার্মী	..	৯০০	অকটেভো	৪৫০০.০০
বাংলা	..	১০০০	অকটেভো	৩৫০০.০০

(গ) চীনা ও ফার্সী ভাষায় মুদ্রণের ব্যয় বেশি পড়ে। চীনা ও ফার্সী পণ্ডিতের জন্য তিন বছরে ব্যয় হয় টাঃ ১৩২০০.০০ এবং ছাপার খরচ হয় টাঃ ১০,০০০.০০ মোট ২৩২০০ টাকা।[৮]

অর্থ সংগ্রহের জন্য মিশনারীরা পৃথিবীর সর্বগ্র আবেদন পত্র প্রচার করেন এবং প্রচার পত্রে একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা দেওয়া হয়। এই পরিকল্পনায় এঁরা দেখান কাগজ, হরফ, মুদ্রণ প্রভৃতি যাবতীয় প্রয়োজনীয় উপাদান নিজেরাই তৈরি করবেন এবং তার ফলে উৎপাদনের ব্যয় হবে সীমিত এবং যেহেতু দেশীয় কর্মীদের কুশলতা ও দক্ষতা উচ্চ মানের সেজন্য ছাপাও হবে উৎকৃষ্ট। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মুদ্রণ পরিচালনার জন্য এই শিল্পের ব্যয়ের বেশ কিছুটা অংশ প্রেস উপার্জন করবে।

মনোহরের পারিবারিক বিষয়ে কোন কিছু জানা যায় না। তবে তিনি শ্বশুরের উত্তরাধিকারী হিসাবে তাঁর বাড়িতেই বাস করেন। তাঁর পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র তখন শৈশব ছাড়িয়ে কৈশোরে পদার্পণ করেছে এবং হয়ত বাবার কাছ থেকে হরফ খোদাই এর কাজ শেখা শুরু করেছে। মনোহর শ্রীরামপুর মিশনের হরফ শিল্প কেন্দ্রের কাজ ছাড়া বাড়িতে কর্মকার পেশার অন্যান্য কাজও করতেন। কিন্তু, যেহেতু তিনি মিশনের হরফ শিল্পের কর্মী ছিলেন, সেজন্য হরফ নির্মাণের কাজ স্বাধীনভাবে করতেন না। এটা ছিল তাঁর পারিবারিক বৃত্তির সততা, যার সমাদর তখনও ছিল না, এখনও এর দৃষ্টান্ত বিরল।

শ্রীরামপুর মিশনপ্রেস যেমন কলকাতা এবং সারা দেশের মুদ্রণের চাহিদার একটা বিরাট অংশের জোগান দিত, তেমনি মনোহরের হরফ যেত কলকাতায় এবং অন্যত্র। কলকাতায় এই শিল্প শ্রীরামপুরের অনেক আগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং সুযোগ সুবিধা ও সঙ্গতি বেশি থাকা সত্ত্বেও কলকাতায় এই শিল্প আশানুরূপ উন্নত হয়নি। পঞ্চানন ও মনোহরের সমকক্ষ শিল্পীরও বোধ হয় অভাব ছিল।

মিশনের হরফ শিল্প দশ বছরের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত ও পর্যায়ক্রমে

উন্নত হলেও ভালো কাগজের অভাবে মিশনের ছাপার গুণগত মান আশানুরূপ বৃদ্ধি পায় না। কিন্তু প্রথম থেকেই মিশনারীরা ভালো কাগজ তৈরি করার চেষ্টা করেন। এদেশে ছাপার উপযুক্ত কাগজ তৈরি করার মত দেশীয় প্রযুক্তিবিরে সন্ধান না পেয়ে ১৮০৪ সালে ইংলন্ডের কমিটিকে কাগজ তৈরি করতে জানে এমন মিশনারীকে কাগজ তৈরিতে প্রশিক্ষণ দিয়ে পাঠাবার অনুরোধ করেন।[৯] ইংলন্ড থেকে কাগজ শিল্প বিশারদ কোন মিশনারী না আসায়, শ্রীরামপুর মিশনারীরা নিজেরাই উদ্যোগী হন ইউরোপীয় প্রথায় কাগজ তৈরি করতে। কিন্তু ১৮১১-এর আগে মিশনের কাগজের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব হয়নি যদিও ১৮০৯ সাল সীমিতভাবে কাগজ তৈরি শুরু হয়।[১০] উইলিয়াম ওয়ার্ড এই কাগজের কারখানার দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং নবাগত মিশনারী জশুয়ারো হলেন তাঁর সহকারী।

এরপর আসে শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের ইতিহাসের সেই ভয়ঙ্কর দিন, ১১ মার্চ, ১৮১২। বিধংসী অগ্নিকাণ্ডে ঐদিন পুড়ে ছাই হয়ে যায় প্রেস ও হরফ ঢালাইখানার বহু অমূল্য উপাদান। একদিকে হয় প্রেসের অপূরণীয় ক্ষতি, অপর দিকে প্রেস পায় বিস্ময়কর জনপ্রিয়তা ও আন্তর্জাতিক পরিচিতি। অগ্নিকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ[১১]

১৮১২ সালের ১১ মার্চ তখন সন্ধ্যা ৬টা। শ্রীরামপুর প্রেস এখন নীরব, সারাদিনের কর্মচাঞ্চল্য এখন থেমে গেছে। শুধু অফিস ঘরে আছেন উইলিয়াম ওয়ার্ড, নিভৃতে বসে সারাদিনের কাজের হিসেব করছেন। দু-একজন লোক তখনও যায়নি, এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করছে। হঠাৎ ওয়ার্ড দেখেন প্রেস ঘরে কাগজের সেলফ থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। তাড়াতাড়ি উঠে প্রেস ঘরে যাবার আগেই ঘর ধোঁয়ায় ভর্তি হয়ে যায়, আর কাগজের মাঝখানে দেখা যায় আগুনের লেলিহান শিখা। ওয়ার্ডের প্রায় দম আটকে আসে। তাড়াতাড়ি বাইরে এসে তিনি 'আগুন', 'আগুন' বলে চেঁচান, আশে-পাশের লোকজন ছুটে আসে। কলসী, ঘড়া ভর্তি করে সবাই জল আনে। ওয়ার্ড সাবধানে ঘরের ছাদে উঠে যান, আর কয়েক জায়গায় ফুটো করে জল ঢালতে থাকেন। কিন্তু আগুনকে সহজে হটানো যায় না, তবে তার বাড়ার রাস্তাটা জল ঢেলে বন্ধ করা হয়। ধোঁয়ায় দম আটকে একজন কর্মী অজ্ঞান হয়ে পড়ে। ধরাধরি করে তাকে মাঠে নিয়ে আসা হয়। রাত দশটার সময় আগুনের

দাপট অনেকটা কমে। কাগজের তাকে শুধু তখনও আগুন থেকে যায়। ঘরের মেঝেতে গোড়ালি ডুবে যাবার মত জল জমেছে। দরকারি কাগজপত্র ও অন্যান্য মূল্যবান জিনিস ঘর থেকে বাইরে নিয়ে আসার জন্য যখন সকলে ব্যস্ত, তখন কোন একজন বোকা লোক ঘরের দু'একটা জানলা খুলে দেয়। বাইরে থেকে বাতাস পেয়ে আগুনের শিখা তাক ছেড়ে সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। তারপর দেখতে দেখতে সারা বাড়িটা আগুনের গ্রাসে চলে যায়। জল ঢেলে তাকে আর শান্ত করা যায় না। রাত বারোটায় ঘরের ছাদ ভেঙে পড়ে। জল ঢালতে এগিয়ে আসে আরও অনেক লোক। বরাত ভালো এই সময়, বাতাস কমে যায়। আগুন বাড়ার আর সুযোগ পায় না। জল ঢেলে তাকে শান্ত করা যায়।

অফিস আর প্রেস ঘরের কাঠের দরজাটা পুড়ে গেলেও মেশিনগুলি বেঁচে যায়। একটা লোহার সিন্দুকে টাকাকড়ি ছিল সেটাও অক্ষত থাকে। কাগজ, পাণ্ডুলিপি প্রভৃতি যা দাহ্য পদার্থ ছিল তা সব পুড়ে ছাই হয়ে যায়। হরফগুলি গলে নষ্ট হয়। বেঁচে যায় গুদামে রাখা ছাপা কাগজ, ৫টি ছাপার প্রেস, দুটি দাঁড় করানো প্রেস, একটি কাগজ তৈরির যন্ত্র, হরফ তৈরির অনেক ছাঁচ, হরফ কাটার যন্ত্রপাতি প্রভৃতি অন্যান্য নানা জিনিস। হরফ গলে মেঝেতে গলিত ধাতুর স্রোত বইয়ে দেয়। আগুন ধ্বংসস্তূপে দুদিন ধরে ধিক ধিক করে জ্বলতে থাকে। প্রেসের পাশেই ছিল কাগজের কল, কাগজের গুদাম, মিশনারীদের বাড়ি, স্কুল ও বোর্ডিং আর তাছাড়া কাছাকাছিই ছিল দেশীয়দের খড়ের ছাউনি দেওয়া মেটে বাড়ি। আগুন ছড়িয়ে পড়লে সব পুড়ে ছারখার হয়ে যেত। সবাই মিলে সারা রাত ধরে চেষ্টা করে আগুনকে আটকে রাখে। বাতাস কমে যেতে সকলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। সারারাত আগুনের সঙ্গে লড়াই করে সবাই শ্রান্ত, বেদনাহত হয়ে প্রেসের সামনে বসে থাকেন। শুধু ওয়ার্ড পাগলের মত ঘুরতে থাকেন ধ্বংসস্তূপের চারপাশে, তাঁর সঙ্গে থাকে হরফ কারখানার কর্মীরা। এই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার সময় কেরী ছিলেন কলকাতায়। পরদিন বিকেলে কেরী এসে সেই ধ্বংসস্তূপের সামনে দাঁড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, "হায়, এ কী কঠিন পরীক্ষা? সারা জীবনের সাধনাকে পুড়িয়ে ছাই করে দিলে?" ওয়ার্ড তখনও ঘুরছেন ছাইগাদার ভেতর। কেরীকে দেখে ছুটে এসে বলেন, "ছাপা কাগজ আর পাণ্ডুলিপির কিছুই অবশিষ্ট নেই, হরফগুলিও সব গলে গেছে।

তবে ঈশ্বরের দয়ায় স্টিল পাঞ্চগুলি বেঁচে গেছে।" এই পাঞ্চগুলি সংখ্যায় চার হাজারের বেশি। পঞ্চানন, মনোহর প্রভৃতি শিল্পীরা দীর্ঘ বারো বছর পরিশ্রম করে এইগুলি তৈরি করেন। ছাই গাদার মধ্যে হরফ গলার ধাতুর পরিমাণ ১০০ মণেরও বেশি।

আগুন প্রায় নিভে এলে সকলে বসেন ক্ষয় ক্ষতির হিসাব করতে। দেশীয় কর্মীদরে নিয়ে মনোহরও থাকেন সেখানে উপস্থিত। কাগজপত্র সব পুড়ে গেছে, তাই তাঁরাই ঠিক বলতে পারবেন কি পরিমাণ হরফ ছিল। ক্ষয়ক্ষতির মোটামুটি একটা হিসাব সকলে মিলে করে ফেলেন। বেদনা যত গভীরই হোক, সকলে মিলে নতুন করে প্রেস গড়ার সংকল্প করেন দৃঢ় ভাবে। ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ দিয়ে মিশনারীরা সাহায্যের জন্য আবেদন পাঠান চতুর্দিকে। ধ্বংসের বিবরণ থেকে পৃথিবীর লোক জানতে পারে প্রাচ্য ভাষায় হরফ নির্মাণ ও মুদ্রণে শ্রীরামপুর প্রেসের অভাবনীয় সাফল্যের কথা। ইংলন্ডের লোক বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়। অল্প শিক্ষিত মিশনারীরা শুধু দেশীয় প্রযুক্তিবিদ্, পণ্ডিত ও কর্মীদের নিয়ে এরূপ বিরাট মুদ্রণ শিল্প গড়তে পারে তা ছিল তাদের কল্পনার বাইরে। কেরী ও ওয়ার্ডের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব তাঁর দেশীয় প্রতিভার আবিষ্কার করেন, আর তাঁদের কাজে লাগিয়ে ইউরোপের তুল্য মুদ্রণ শিল্প গড়ে তোলেন। শ্রীরামপুর মিশনারীরা প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণ করে দেখান যে পাশ্চাত্য প্রশিক্ষণ ছাড়াই এদেশের প্রযুক্তিবিদরা আধুনিক শিল্প গঠনে অক্ষম নন। কেরীর আদর্শ অনুসরণ করলে ঊনিশ শতকেই ইউরোপের মত বাংলায় শিল্প বিপ্লব শুরু হয়ে ভারতের নবজাগরণ ত্বরান্বিত করত।

১৮১২ সালের ১১ মার্চ শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত দ্রব্যাদির যে তালিকা প্রকাশ করা হয়, তা নিম্নরূপ ঃ

(ক) প্রেসের অফিস (ওয়ার্ডের বসিবার ঘর)

১. প্রেসে মুদ্রিত বই ভর্তি ৪টি বুক কেস

২. প্রেসে মুদ্রিত, বাঁধাই করা, নামাঙ্কিত করা সম্পূর্ণ একসেট বই

৩. চেয়ার, টেবিল, আলমারী প্রভৃতি আসবার পত্র

(খ) প্রুফ সংশোধন ও হিসাব রক্ষকের ঘর ঃ

১. ড্রয়ার সমেত বড় টেবিল (দরকারি কাগজ পত্র সমেত)

২. একটি বদ্ধ কাবার্ড (মিশন সংক্রান্ত দরকারি কাগজপত্র সমেত)

৩. বহু পাণ্ডুলিপি, অভিধান হিসাব পত্রের কাগজে প্রভৃতি সমেত কয়েকটি তাক।

(গ) প্রেসের বড় ঘর

১. প্রাচ্য ভাষার হরফের ফাউন্ট

(ক) চীনা ধাতুর হরফ..... ৪ বাক্স
(খ) নাগরী (বড়) হরফ..... ৩৩ বাক্স
(গ) নাগরী (ছোট) হরফ..... ১২ বাক্স
(ঘ) তেলুগু হরফ..... ১৪ বাক্স
(ঙ) পাঞ্জাবী হরফ..... ৬ বাক্স
(চ) বাংলা হরফ..... ১২ বাক্স
(ছ) বর্মী হরফ..... ১২ বাক্স
(জ) ফার্সী হরফ..... ১৮ বাক্স
(ঝ) আরবী হরফ..... ৮ বাক্স
(ঞ) ওড়িয়া হরফ..... ৬ বাক্স
(ট) মারাঠি হরফ..... ১ বাক্স
(ঠ) তামিল হরফ..... ৬ বাক্স
(ড) কাশ্মিরী হরফ..... ১ বাক্স
(ঢ) তামিল (ইংল্যান্ড)..... ১ বাক্স
(ণ) গ্রীক হরফ..... ৪ বাক্স
(ত) গ্রীক (বড়)..... ১ বাক্স
(থ) হিব্রু (ছোট) হরফ..... ১ বাক্স

(এই গুলি সাজিয়ে রাখা ছিল, এছাড়া ঘরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল অসংখ্য হরফ)

২. চীনা পদ্ধতিতে (ব্লক) কাঠের হরফে লুন-ই-বই এর দুই খণ্ড ও কনফুসিয়সের সুড়-উড় ও তাহোর।

৩. ইংরাজি ভাষার ফাউন্টের বাক্স

(ক) পাইকা ৫ বাক্স (খ) ফ্রেঞ্চ ক্যানন ২ বাক্স (গ) ডবল পাইকা ৪ বাক্স (ঘ) স্ক্রুপ ৪ বাক্স (ঙ) ওল্ড ইংরেজি ২ বাক্স (চ) সাধারণ ইংরেজি ১৪ বাক্স (ছ) পাইকা ১২ বাক্স (জ) পাইকা ফেসেড ১০ বাক্স (ঝ) লম্বা প্রাইমার ১২ বাক্স

(ইহা ছাড়া বাক্সের বাইরে খোলা ছড়ানো ছিল অসংখ্য বিভিন্ন ভাষার হরফ)

৪. অন্যান্য জিনিস ঃ

(ক) হরফের বাক্সের ফ্রেম ৫৭টি (খ) পাথর রাখার বাক্স ৪০টি (গ) হরফের বাক্সে ২২৯টি (ঘ) গ্যালী ৮০টি (ঙ) হরফ আটকাবার বিভিন্ন জিনিস (কুওইন, রিগলেট প্রভৃতি (চ) চুনাপাথর ৪০টি (ছ) পাণ্ডুলিপি রাখার তাক (মূল্য ৭০০ টাকা) (জ) ড্রয়ার সমেত বুককেস ১টি (ঝ) ১৮ ইঃ ব্যাসের গোলক ২টি (ঞ) লিনসিড তেলের বড়জার ১টি (ট) রং ভর্তি টিন ১টি (ঠ) ড্রয়ার কয়েকটি (ণ) বাঁধাই এর যন্ত্রপাতি ভর্তি ১টি বাক্স (ত) কাগজ-ঘরের অর্ধেক ভর্তি তাক

৫. কাগজবিলাতী

(ক) ১০ টাকা রীম ৮৩২ রীম (খ) ২০ টাকা রীম ২১০ রীম (গ) ৪০ টাকা রীম ৯৫ রীম (ঘ) ৪৫ টাকা রীম ৮০ রীম (ঙ)৩০ টাকা রীম ৬০ রীম (চ) ২৫ টাকা রীম ২৫ রীম

(ক) পাটনাই কাগজ ৫০ রীম (খ) বিলাতী রয়েল ১/২ রীম (খ) বিভিন্ন প্রকৃতির দেশী কাগজ ১০০ রীম (ঘ) ব্লু মার্বেল প্রভৃতি বাঁধাই এর প্রচুর কাগজ

(গুদামে রাখা কাগজের স্টকটি আগুনের হাত থেকে রক্ষা পায়)

৬. গ্রন্থাদি ঃ

(ক) কোলব্রুকের শব্দ কোষ ৮ (খ) মেঘদূত ২২ (গ) এন, টি হিন্দি ১০০ (ঘ) লুক বাংলা ৪০০ (ঙ) রাজাবলী বাংলা ২৪ (চ) এসেন্স অফ স্ক্রীপচার বাংলা ১০০ (ছ) ভার্জিলের বুকফোর বাংলা ২৪ (জ) ব্যাকরণ বাংলা ২৪ (ঝ) কথোপকথন বাংলা ২৩ (ঞ) ব্যাকরণ মারাঠি ২৪ (ট) অভিধান মারাঠি ৮ (ঠ) এসেন্স অফ্ স্ক্রীপচার ফার্সী ৭০০ (ড) ইনট্রোডাকসন টু রিডিং ইংরাজি ১০৫ (ঢ) গ্রামার এন্ড এক্সাইজ ১২০ (ণ) রামায়ণ (ইং) ১২ (ত) হ্যাপী ডেজ ১৪ (থ) সিলেকসন অফ হিমসঙ্গ (দ) রেনলের মেমায়ার ১, সিলোন ১, ব্রুসেলের ট্রাভেলস্১, ক্যাম্পবেলের গসপেল ১, ট্রান্সস্লেশন ১, জনসনের অভিধান ২, উডরিজের ফ্যামিলি এম্পরিয়াম ১, ল্যাটিন ও গ্রীক বাইবেল ইত্যাদি।

পাণ্ডুলিপি

সংস্কৃত অভিধান ৫, তেলুগু বাইবেল ১, বহু ভাষিক শব্দ কোষ ১, বাংলা অভিধান ১, রামায়ণ ৩, এছাড়া ছিল বিভিন্ন ভাষায় বাইবেলের অনুবাদের অংশ।

৮. প্রেসে ছাপারত বই

১. হিস্টিরিক্যাল বুক্‌স (সং), নিউটেষ্টামেন্ট (ং) গসপেল (ফাঃ) ইত্যাদি।

৯. বিবিধ গ্রন্থ ঃ কনফুসিয়স (২য় সং), চীনা গ্রামার, হিন্দুস, অক্‌স বাইবেল সোংঃ এর বিবরণ, সং রামায়ণ, বাংলা অভিধান, পাঞ্জাবী গ্রামার, সার্কুলার লেটার, ইনট্রোডাকসন টু ল্যাটিন, গ্রন্থাগারের ক্যাটালগ, ক্যাল সার্কুলেটিং লাইব্রেরীর ক্যাটালগ, গ্রীক প্রিন্টিং ইত্যাদি এর অন্যান্য আরও অনেক ব্যবহার্য জিনিস।

হিসাবের কাগজপত্র সব পুড়ে গেলেও মিশনারীরা ক্ষয়ক্ষতির মোটামুটি তালিকা তৈরি করে পৃথিবীর চতুর্দিকে আবেদন পাঠান। প্রাচ্য ভাষায় মুদ্রণের অভাবনীয় সাফল্যের কথা সারা বিশ্বের লোক জেনে বিস্ময়ে হতবাক হয়। স্বল্প শিক্ষিত গ্রাম্য মিশনারীরা শুধু দেশীয় কর্মীদের সাহায্যে এতবড় মুদ্রণ শিল্প গড়তে পারে তা তাদের কল্পনার বাইরে ছিল। কিন্তু এদের প্রচারে দেশীয় কর্মীদের কৃতিত্বের কথা বিশেষ উল্লেখ না থাকায় গৌরবের প্রধান অংশ তারা মিশনারীদের দেন। তবু কেরী ও ওয়ার্ড দেশীয় প্রতিভার যে আবিষ্কার করেন এবং সেই প্রতিভা বিকাশে যে সহায়তা করেন তা অনুকরণ যোগ্য আদর্শ স্থাপন করে। ইউরোপীয় প্রশিক্ষণ ছাড়াই এদেশীয় প্রযুক্তিবিদরা যে ইউরোপের সমতুল্য আধুনিক শিল্প গড়তে পারেন তার বাস্তব প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়। এঁদের আদর্শ অনুসৃত হলে বহু পূর্বেই ভারতে শিল্প বিপ্লবের সূচনা হত।

উল্লেখপঞ্জী

১. Serampore Mission : Memoir translations 1807
২. Ibid : Memoir Ibid
৩. Mrs, Voigf : Memoirs of Hannah Marshman (MSS)
৪. Wanger E. S. : Missionary Biography, V.I.
৫. Serampore Mission : Memoir of translation 1809
৬. Serampore Mission : Memoir of translation 1807
৭. Smith Georges : William Carey P. 181
৮. Serampore Mission : Periodical Accounts 1807-10
৯. Carey and others : Letter to BMS, 25th Sept., 1804
১০. Potts E. D. : Sermapore Press and its printer
১১. B M S : Periodical Accounts 1812

৮

মিশনের হরফ ও মুদ্রণ শিল্পের গৌরবময় অধ্যায় : মনোহরের কৃতিত্বপূর্ণ ভূমিকা

দৈব দুর্ঘটনার প্রচণ্ড ঝঞ্ঝায় শ্রীরাপুর মিশন প্রেসের কর্মীরা যে হতাশায় ভেঙে পড়েননি তার পরিচয় দেখা যায় দ্রুততালে নতুন করে প্রেস গড়ার উদ্যমের মধ্যে। পাণ্ডুলিপিগুলি ভস্মীভূত হওয়ায় ভাষা সাহিত্যের যে বিপুল ক্ষতি হয় তা পূরণ করা কোন দিন সম্ভব হয়নি। বাংলা তথা ভারত যে বহু ভাষিক শব্দ কোষ থেকে বঞ্চিত হল এই বিধংসী আগুনের জন্য, তা আজও তৈরি করা সম্ভব হয় নি। চরম ভাষা বিরোধ বার বার ভারতকে যে উত্যক্ত হতে হয়েছে, তার প্রতিবিধানের প্রয়াস অংকুরে বিনষ্ট হয়। কিন্তু হরফের স্টিল পাঞ্চ ও মুদ্রণ যন্ত্রগুলি আগুনের হাত থেকে বেঁচে যাওয়ায় খুব তাড়াতাড়ি নতুন হরফ তৈরি করা সম্ভব হয়। এরূপ দক্ষতার পরিচয় সে যুগে একটি বিরল দৃষ্টান্ত এবং প্রমাণ করে মনোহর ছিল সে সময়ে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ হরফ শিল্পী।

মনোহরের নেতৃত্বে দেশীয় হরফ শিল্পীরা বিপুল পরিশ্রমে অল্প দিনের মধ্যে বিনষ্ট টাইপগুলি আবার ঢালাই করে ফেলেন। মুদ্রণ যন্ত্রগুলি অক্ষত থাকায় টাইপ তৈরি হবার পরই পামার কোম্পানির গোডাউন ভাড়া নিয়ে প্রেসের কাজ শুরু করা হয়। প্রেসের নতুন বাড়ি তৈরি করার কাজও আরম্ভ করতে দেরি হয় না। অগ্নিকাণ্ডের পর মনোহর ও হরফ শিল্পীদের রেখে প্রেসের অন্যান্য কর্মীদের বেতন আগাম দিয়ে ছুটি দেওয়া হয়। অল্প কয়েক জন শুধু থাকে জরুরী কাজ করার জন্য। অভাবনীয় কর্মদক্ষতার ফলেই জুলাই (১৮১২) এর মধ্যেই

প্রেসের কাজ পুরোদমে শুরু হয়ে যায়। মনোহর বাংলা, হিন্দি, পাঞ্জাবী, ওড়িয়া, তেলুগু প্রভৃতি ভাষায় হরফ তৈরি করে দেন এবং ১৮১৩-র এপ্রিলের মধ্যেই বিনষ্ট সব ভাষারই নতুন হরফের ফাউন্ট তৈরি হয়ে যায়।

পৃথিবীর যে কোন দেশের শিল্পীরা এরূপ কৃতিত্বে কাজ করলে বিপুল সমাদর, সম্বর্ধনা ও পুরস্কার লাভ করেন। খুবই দুর্ভাগ্যের বিষয় প্রতিভাবান দক্ষ এই সব শিল্পীদের বরাতে কিছুই জোটেনি। পরবর্তীকালের ইতিহাসকারেরাও নিষ্করুণভাবে নীরব থেকেছেন এঁদের কৃতিত্ব সম্বন্ধে। অগ্নিকাণ্ডের পরবর্তী পর্যায়ে প্রেসের কাজ দ্রুত হারে বেড়ে যায় ও প্রসারিত হয়।

এই দুর্ঘটনা শ্রীরামপুর মিশনের একদিক থেকে হয় শাপে বর। প্রেসের ক্ষতির পরিমাণের কথা দাবানলের মত ইংলন্ডে ও আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়ে। রাইল্যান্ড, ফুলার প্রমুখ ব্যাপটিষ্টরা ক্ষতিপূরণের আবেদন চতুর্দিকে প্রচারিত করেন। ইউরোপকে হতবাক করে দেবার মত এঁদের ছাপার কাজ। রূপকথার কাহিনীর মত ইংলন্ড ও আমেরিকার লোকেরা শোনে শ্রীরামপুর প্রেসের কথা। এদের কাছে সব চেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হল মুদ্রণের এই বিরাট সাফল্য এনেছেন স্বল্প শিক্ষিত কয়েকজন মিশনারী শুধুমাত্র দেশীয় কর্মীদের সহায়তায়। পাশ্চাত্য দেশের বিজ্ঞানী বা যন্ত্রবিদদের সহায়তা ছাড়া কি করে এ সম্ভব তা তারা বুঝতে পারে না। খুবই দুঃখের ব্যাপার শ্রীরামপুরের মিশনারীরা তাঁদের প্রচারে দেশীয় প্রতিভার কৃতিত্বের কথা উল্লেখ করেন নি। কৃতিত্বের সবটাই মিশনারীর ওপর অর্পিত হয়। এমন কি অনেকে মনে করেন মিশনারীরাই দেশীয় কর্মীদের হরফ তৈরির কাজ শিখিয়েছেন। ক্ষতি পূরণ বাবদ বিপুল অর্থের সঙ্গে শ্রীরামপুর মিশন লাভ করেন একজন বিদেশি হরফ শিল্পীর সাহায্য। সুদীর্ঘ বারো বছর বিদেশি শিল্পীর সাহায্য ছাড়াই এই হরফ শিল্পটি গৌরবের সঙ্গে পরিচালিত হয়েছে। তবু এই বিদেশি শিল্পীর আগমন দেশীয় কর্মীদের উৎসাহিত করে। জন লসন নামক এই হরফ শিল্পী ১৮১২ সালের ১৩ আগষ্ট শ্রীরামপুরে আসেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি একজন অংকন শিল্পী ছিলেন এবং মিশন বিদ্যালয়ে অংকন শেখাবার দায়িত্ব গ্রহণের জন্য তিনি এসেছিলেন। কিন্তু যেহেতু তিনি হরফ শিল্পের কাজও জানতেন সেজন্য দেশীয় কর্মীদের হরফ শিল্পের প্রশিক্ষণ দেবার দায়িত্ব তাঁকে দেওয়া হয় এবং তিনি শুধু চীনা ও বাংলা হরফের আকার

FAC-SIMILE OF SPECIMENS

OF

THE SACRED SCRIPTURES,

IN THE

Eastern Languages.

Text. "The people that sat in darkness saw great light; and to them which sat in the region and shadow of death, light is sprung up." [illegible]

SUNGSKRIT.

अन्धकारेऽयूपविष्टा लोका महाले[illegible]
मृत्योर्देशे छायायाञ्चोपविष्टाः प्रति आ
लोक उदेति ।—

MAHRATTA.

[illegible]

BENGALEE.

যে লোক অন্ধকারে বসিয়াছিল তাহারা মহা আলো
দেখিতে পাইয়াছে যাহারা মৃত্যুর দেশ ও ছায়াতে
বসিল তাহারদের নিকটে আলো প্রজ্বলিত হইয়াছে।

OORIYA.

ଯେଉଁ ଲୋକ ଅନ୍ଧକାରରେ ବସିଥିଲେ ସେମାନେ ମହା ଆଲୁଅ
ଦେଖିବାକୁ ପାଇଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମୃତ୍ୟୁର ଦେଶ ଓ ଛାୟାରେ
ବସିଲେ ସେମାନଙ୍କର ନିକଟ ଆଲୁଅ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି।

BRIJ-BHASHA.

[illegible]

KURNATA.

[illegible]

BULOSHEE.

[illegible]

The following are part of the Letters of the Alphabet only.

MOLTANEE.

[illegible]

GUJURATTEE.

[illegible]

ARABIC.

الناس الجلوس في الظلام فقد راو ضياء عظيما والجا
لسون في ضلع الموت وظله اضاء عليهم ضياء *

MALAY.*

Mlawm' itu jàng dûdolh pada kalàm, fudah meli-
hat fawàtu taràng jang besàr: dàn bagi fegala
'awrang jang dûdolh pada tânah dàn bâjang
mawt 'itu, taràng pawn sudah terbit baginja.

* This version is intended for the Christians of Amboyna.

MALAY.*

[illegible]

* This version is printed under the superintendence of the Batavia Literary Society, and is intended for the Christians on the island of Java.

ARMENIAN.*

[illegible]

* Part of the letters of the Alphabet only are here inserted, the fount of types not being ready. [illegible]

HINDOOSTHANEE,

IN THE PERSIAN CHAR[ACTER].

TEXT. " The people that sat in darkness saw gre[at light, and to them] which sat in the region and shadow of death, ligh[t is sprung up.]"

آدمی ... جو اندھیرے مین بیٹھے تھے بڑی روشنی
دیکھی اور ... جو موت کے ملک اور سایہ مین بیٹھے تھے نور
ملوہ گر ہوا

PERSIAN.

آن جمع ... در ظلمت نشسته بودند نور عظیمی را
مشاهده نمودند و بر آنکسانی که در مرز و ظلال مرگ
ساکن بودند ... روشنی تابید

TAMUL.

இருளிலிருக்குஞ் சனம் பெரிய வெளிச்சத்தைக்
கண்டது மரணத்தின் நிழலின் தேசத்திலும் ...
இருக்கிறவர்களுக்கு வெளிச்சம் உதித்தது.

CINGALESE.

අඳුරෙහි උන් ජනතාව මහත් එළියක් ...
දුටුහ තාවද මරණයෙ ...
...

TELINGA.

అంధకారాలయందు కూర్చుండిన లోకులు మహాతేజ
స్సును చూచిరి మృత్యువుయొక్క దేశమందు నీడయం
దున్న కూర్చుండిన వారిమీదను వెలుగు ప్రకాశిం
చెను।—

PUSHTOO.

هر خلق چه په تیاره کښی ناست وو عظیم لوی روښنائی
ولیده او د مرگ ملک او په سوري کښی ناستو په لوري
روښنائی ظاهره شوله

SIKH, OR PUNJABEE.

ਅਰਥਤੇ ਅਂਧੇਰਿਆਂ ਵਿਚ ਬੈਠਦੇ ਹੋਇਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵਡੇ
ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਡਿਠਾ ਮਉਤ ਦੇ ਦੇਸ ਅਤੇ ਛਾਯਾ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹੋਇ
ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਚਾਨਣ ਉਦੇ ਹੋਇਆ।

KASHMEER.

[illegible]

HINDOOSTANHEE.

जो लोग अंधियारेमें बैठे थे उन्होंने बडी रोशनी देखी
और मौतके देश वा छायामें बैठनेवालोंके वरम् उजियाला
जाहिर हुआ।—

UHUMIYA, OR ASSAM.

যিবিলাক লোক অন্ধকাৰত বহিছিল সেই বিলাকে
মহা পহৰ দেখিবলৈ পাইছে। যিবিলাক মৃত্যুৰ দেশত
আৰু ছাঁত বহিল সেই বিলাকৰ একেৰে পহৰ প্ৰজ্বলিত
হইছে

BURMAN.

[illegible]

CHINESE.

WOOD BLOCK.

TEXT. "And he called the multitude, and said unto the[m], Hear, and understand: not that which goeth into the mouth defileth a man; but that which cometh out of the mouth, this defileth the man."

MATH. xv. 10, 11.

他喚衆曰聽而明之所入口者則不穢人也然所以從口而出即汚人也

CHINESE.

MOVEABLE METAL TYPES.

TEXT. "In the beginning God created the heavens and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was upon the f[ace] of the deep: and the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, Let there be light: and there was light." GEN. i. 1—3.

原始神創造天地地未成形隱氣蒞于空虛幽邃之內神風迎行水上神日光而遂光

ছোট করার কৌশলটি দেশীয় হরফ শিল্পীদের শিখিয়েছেন। লসনের বংশের একজন মিশনারী (ই. এস, ওয়েঙ্গার) পরবর্তীকালে (১৯০৫) বাংলায় আগাত ব্যাপটিষ্ট মিশনারীদের যে গ্রন্থ (Missionary Biographis in 4 vols.) লেখেন তাতে লসন সম্পর্কে আছে,

"13.8.1812 : Removed to Serampore and put himself to work required to him. The great work he accomplished was reduction of the types of Eastern Languages, particularly the Bengali and Chinese.

1814 : Still engaged in reducing the types, a task which is expected to take several years....

1815 : Having taught the natives to cut punches, he did not deem it to do this mechanical work any longer."

এই বিবরণী থেকে বোঝা যায় তিনি শুধু হরফের আকার ছোট করার জন্য দেশীয় শিল্পীদের পাঞ্চ কাটতে শেখান এবং নিজে কোন কাজ করেন নি এবং তাঁর অভিমতে এই কাজ করতে বেশ কয়েক বছর লাগবে। তাঁর কাছ থেকে হরফ ছোট করার কৌশলটা এক বছরের মধ্যে শিখে মনোহরও তাঁর সহকর্মীরাই সব কাজটা করেন এবং লসনের আশংকা মত দীর্ঘ সময়-ও তার জন্য নেননি। ১৮১৪ সালে ইয়েট্‌সকে লেখা একটি চিঠিতে লসন নিজেও এ সম্পর্কে বলেছেন, "I am now employed in cutting punches for Malay Bible ... I have been principally engaged as an artist ever since my arrival in India. At present I do nothing of the Chinese. I taught two natives the method of reducing the character, they are now employed in the department, I teach drawing in the school..."

শ্রীরামপুর মিশনের ১৮১৫ বিবরণেও আছে দেশীয় শিল্পীদের হরফের আকার ছোট করার কৌশল শেখানে ছাড়া শ্রীরামপুর শিল্পে লসনের আর কোন অবদান নেই। তিনি স্কুলে আঁকা শেখাতেন। কিন্তু মনোহর এবং তাঁর দেশীয়, সহকর্মীদের কৃতিত্বের স্বীকৃতি না দিয়ে লসনের অবদানকে অতিরঞ্জিত করার প্রয়াস দেখা গেছে। যেমন, ডঃ সবিতা চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, "শ্রীরামপুর প্রেসের সঙ্গে যুক্ত থাকিয়া তিনি (লসন) এই বিষয় শিক্ষার একটি স্কুলও খুলিয়া ছিলেন। ইহা বাংলা দেশের মুদ্রণ বিষয়ক প্রথম বিদ্যালয়, ভারতেও ইহা প্রথম।" ডঃ চট্টোপাধ্যায় কোথায় এই খবরটা

জোগাড় করেছেন তা উল্লেখ করেন নি। লসনের চিঠি, তাঁর অমুদ্রিত জীবনী, মিশনারীদের বিবরণী প্রভৃতি কোথাও এরূপ ইঙ্গিত দেখা যায় না। লসন নিজে চিঠিতে লিখেছেন যে তিনি মাত্র দু'জন দেশীয় কর্মীকে শেখান। এ থেকে অনুমান করা যায় না যে তিনি হরফ শিল্প শেখানো বিদ্যালয় করেছিলেন। এরূপ অনুমান দেশীয় সৃজনী প্রতিভার প্রতি শুধু উপেক্ষাই বোঝায় না, তাঁদের কৃতিত্বের মূল্যায়নের কাজে বাধা স্বরূপ হয়। ইংরেজরা হাতে করে না শেখালে আমরা কিছু করতে পারি না এই ভ্রান্ত ধারণার এটি একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। লসনের কৃতিত্বকে বড় করে দেখানো জন্য ডঃ চট্টোপাধ্যায় আরও বিভ্রান্তিকর তথ্য পরিবেশন করে বলেছেন, 'সচিত্র গ্রন্থের চিত্রাবলীর জন্য ধাতু নির্মিত ব্লক তিনিই প্রথম করেন।' শ্রী পান্থ তাঁর 'যখন ছাপাখানা এলো' বইটিতে এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করে ডাঃ চট্টোপাধ্যায়ের ধারণা যে ভুল তা প্রমাণ করেছেন।

১৮১২-র পর ছাপার কাজে নতুন জোয়ার আসে, আর সেই জোয়ারকে স্ফীত ও উদ্দাম করে মনোহরের নেতৃত্বে হরফ শিল্পের দ্রুত উন্নতি ও প্রসার। অনেক নতুন ভাষায় ছাপা শুরু হয় এবং এজন্য প্রয়োজন হয় নতুন নতুন পাঞ্চ তৈরি করাও নতুন করে সব হরফই ঢালাই করা। মনোহর ও তাঁর সহকর্মীরা মনোযোগ দেন হরফের আকার কমিয়ে স্পষ্টতা ও সৌকর্য বাড়াতে। ছাপার কাজ বাড়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হরফ তৈরির কাজ যে বাড়ে তার সমস্ত দায়িত্ব নিতে হয় মনোহর ও তাঁর সহকর্মীদের।

অনুকূল পরিবেশে ও প্রতিভাধর শিল্পীদের সহায়তায় শ্রীরামপুর মিশনের হরফ শিল্পকেন্দ্র সেই সময় (১৮০০-১৮৩০) পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ হরফ শিল্প কেন্দ্রে পরিণত হয়। মনোহর বা তাঁর সহকর্মীদের প্রথাগত ধারায় ফলিত বিজ্ঞানের শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ ছিল না। ধাতুর সচল হরফ শিল্পটি ও জাতীয় ভারতীয় ঐতিহ্যের সম্পর্ক শূন্য। তাই পঞ্চানন মনোহরও কৃষ্ণচন্দ্র নিজেদের প্রতিভাবলে এই নতুন প্রযুক্তি বিজ্ঞানে জ্ঞান অর্জন করেন এবং নিজেদের অভাবনীয় দক্ষতার বলে বাহিরের কোন সাহায্য ছাড়াই প্রাচ্য ভাষার হরফ শিল্পের জন্ম দেন। বীক্ষণগারে প্রথাগতভাবে গবেষণা পরিচালনা না করেও এই সব প্রযুক্তি বিজ্ঞানীরা ক্রম পর্যায়ে হরফের আকার, সৌকর্য, স্পষ্টতা, সমরৈখিকতা প্রভৃতির গুণগত মান বাড়িয়ে তোলেন। মনোহরের তৈরি বাংলা হরফ পরবর্তীকালে এতো সুন্দর ও সুছাঁদ হয় যে অনেক গবেষক এর সঙ্গে শতাধিক বছর পরে প্রচলিত মনোলিথিক টাইপের তুলনা করেন। খুবই বিস্ময়ের ব্যাপার ইতিহাস এঁদের

কৃতিত্ব সম্বন্ধে বিস্তারিত পর্যালোচনায় কোন আগ্রহ দেখায় নি। মিশনারীরাও অত্যন্ত বেদনাদায়কভাবে এঁদের কৃতিত্বের কথা আলোচনা করেন নি তাঁদের বিবরণীতে। ১৮১২ সালের আগুনে কেরীর বাংলা অভিধানের পাণ্ডুলিপিটি সম্পূর্ণ পুড়ে যায়। ১৮১৫-১৬ সালের মধ্যে কেরী আবার ঐ পাণ্ডুলিপি রচনা করেন এবং অভিধানটি ছাপতে দেন। ছাপা কিছুদূর এগোলে কেরী দেখেন বড় আকারের হরফ ব্যবহার করায় বইটি পাতার সংখ্যা অনেক বেড়ে যাবে এবং যেমন সাধারণের ব্যবহারের অসুবিধা হবে তেমনি ব্যয় এত বেশি হবে যে সাধারণের ক্রয়যোগ্য মূল্যে বইটি দেওয়া যাবে না। কেরী তখন মনোহরকে ছোট বাংলা হরফ তৈরি করতে বলেন। মনোহর লসনের কাছ থেকে হরফ ছোট করার কৌশল শিখেছিলেন এবং হরফের স্পষ্টতা ও সৌন্দর্য অটুট রেখে তিনি এক ফাউন্ট ছোট হরফ তৈরি করেদিলেন।

১৮২৫ সালে ঐ হরফে কেরীর দুই খণ্ডের বাংলা অভিধান মুদ্রিত হয়। পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি শব্দ সংযুক্ত হয় এই অভিধানে। মনোহরের এই কৃতিত্বের কথা কোথাও উল্লিখিত হয়নি। আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন হরফ বিশেষজ্ঞ ট্যালবট বেইনস্‌রীড লিখেছেন, "কেরীর নেতৃত্বে শ্রীরামপুরের ব্যাপটিষ্টা মিশনারীরা উনিশ শতক গোড়ার দিকে বিভিন্ন প্রাচ্য ভাষা সমূহের হরফ নির্মাণ ও গ্রন্থ মুদ্রণে ভীষণ ব্যস্ত ছিলেন। ... সব হরফই হয় মিশনারীদের দ্বারা তৈরি অথবা তাঁদের দ্বারা শিক্ষণপ্রাপ্ত দেশীয় শিল্পীদের দ্বারা তৈরি। ইংলন্ডের খুব অল্প সাহায্য বা বিনা সাহায্যেই এগুলি নির্মিত হয়।" এই ভুল মন্তব্য অনেকেকেই বিভ্রান্ত করেছে। শ্রীরামপুর মিশনের মুদ্রণ সম্পর্কে মিশনের বিবরণীতে নেই এমন তথ্য, বিশেষজ্ঞ রীড কোথা থেকে পেলেন এই কথা বিস্ময়ের সঙ্গে অনেকে ভেবেছেন, কারণ রীড কোন উৎস থেকে এই তথ্য পেয়েছেন তার উল্লেখ করেন নি। মিশনারীরা কোথাও বলেন নি যে তাঁরা হরফ তৈরি করেছেন বা দেশীয় শিল্পীদের হরফ তৈরি শিখিয়েছেন। খুবই পরিতাপের বিষয় যে বিদেশি বিশেষজ্ঞরা দেশীয় প্রতিভার এইভাবে অবমাননা করেন তার উপযুক্ত জবাব দেবার আগ্রহ বিস্ময়করভাবে আমাদের মধ্যে অনুপস্থিত।

শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের হরফ নির্মাণকেন্দ্র দীর্ঘদিন সারা এশিয়ার প্রাচ্যভাষার হরফ সরবরাহ করেছে। ১৮১৬-২৪ এর মধ্যে প্রেসের গৌরব যখন চরম শীর্ষে তখন এশিয়ায় শ্রীরামপুরের চেয়ে বড় হরফ নির্মাণকেন্দ্র ছিলনা। এই কেন্দ্র গড়ার সব কৃতিত্ব মনোহর ও তাঁর সহকারীবৃন্দের।

পৃথিবীর অন্য যেকোন দেশ মনোহরের মত প্রযুক্তিবিদের জন্য গর্বে স্ফীত হত।

মনোহর তাঁর বাড়িতে কামার শালায় ধাতুর বিভিন্ন দ্রব্যাদি তৈরি করতেন। কিন্তু বাড়িতে হরফ তৈরি করতেন না, কারণ হরফের জন্য তাঁরা মিশন প্রেসে চাকুরী করতেন। এদের ব্যবসা সততাও ন্যায়পরায়ণতা দেখে মিশনারীরা হয় খুব বিস্মিত হয়েছিলেন এবং নির্ভয়ে এঁদের কাজের ওপর নির্ভর করতেন। কুশলী শিল্পী হলেও এঁদের পরিশ্রমিকের হার ছিল খুব কম। ইংলন্ডের ক্যাসলন কোম্পানি যেখানে প্রতি পাঞ্চের দাম ১ গিনি (প্রায় ১৫ টাকা) দাবি করত, এঁরা সেখানে মাত্র পাঁচ সিকায় (১.২৫ টা) সেই পাঞ্চ তৈরি করতেন, অথচ ক্যাসলনের পাঞ্চের চেয়ে এঁদের পাঞ্চ কোন অংশে নিম্নমানের ছিল না।

মনোহরের পারিবারিক ইতিহাস সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। অনুমান করা যায় তিনি স্ত্রী পুত্র নিয়ে কোম্পানি বাগানে পঞ্চাননের বাটিতে বাস করতেন এবং সেখানে কামারশালার কাজও করতেন। তাঁর সহকর্মীদের অনেকেই ঐ অঞ্চলে থাকতেন। মনে হয় পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র পিতার সঙ্গে কাজে যোগ দেবার আগে মিশনের স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। খুবই দুর্ভাগ্যের ব্যাপারে, এঁদের সম্বন্ধে নির্ভর তথ্য সংগ্রহ করা এখন কষ্টসাধ্য ব্যাপার।

উল্লেখ পঞ্জী

১. রীড, ট্যালবট বেল্‌স্ ছ
২. wenger E. S. : Missionary Biographies I (MSS)
৩. Wenger E. S. : Missionary Biographies (MSS) vol. I
৪. Lawson : Letter to Yates in Baptist Magaxine 1825
৫. চট্টোপাধ্যায় সবিতা ঃ বাংলা সাহিত্য ইউরোপীয় লেখক পৃঃ ৩২৬
৬. শ্রী পান্থ ঃ যখন ছাপাখানা এলো পৃঃ ৯০-৯১
৭. Johnson : History of old English letters p. 20
৮. Smith George : Life of William Carey p. 182

৯

শ্রীরামপুর মুদ্রণ ও হরফ শিল্পের পরবর্তী অধ্যায় : কৃষ্ণচন্দ্রের অবদান

মনোহর কর্মকারের পুত্র কৃষ্ণচন্দ্রের জন্ম হয় শ্রীরামপুরে ১৮০০ সালে। তাঁর মাতা লক্ষ্মীমণি ছিলেন হরফ শিল্পের পুরোধা পঞ্চানন কর্মকারের একমাত্র কন্যা। কৃষ্ণচন্দ্র মাতামহকে কাজে দেখবার সৌভাগ্য লাভ করেননি। কিন্তু তিনি দেখেছেন তাঁর কাজ আর পেয়েছেন তাঁর শিক্ষার পরিচয়। পিতা মনোহর তাঁর জন্ম সময়ে মিশন টাইপ ফাউন্ড্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করে বিপুল উদ্যমে গড়ে তুলতে শুরু করেন ঐতিহ্যবাহি শ্রীরামপুর টাইপ ফাউন্ড্রীর সুদৃঢ় বনিয়াদ। ১৮০৪ সালে মৃত্যুর আগে পঞ্চানন দেবনাগরী, ওড়িয়া ও মারাঠি হরফ তৈরির যে সূচনা করেছিলেন মনোহর কৃষ্ণচন্দ্রের জন্মের পরে অর্থাৎ ১৮০৭ সালের মধ্যে সম্পূর্ণ করেন এবং তার সঙ্গে যোগ হয় পাঞ্জাবী (গুরুমুখী) ও বর্মী ভাষার হরফ। মনোহর তাঁর দীর্ঘ ৪০ বছর কর্মজীবনে বিভিন্ন হরফের ফাউন্ট তৈরি করেন এবং শ্রীরামপুর টাইপ ফাউন্ড্রীর বাংলা, দেবনাগরী, ওড়িয়া ও মারাঠি (এগুলি তাঁর শ্বশুর পঞ্চানন তৈরি করেন) ছাড়া সব ভাষার হরফের নির্মাতা মনোহর। কৃষ্ণচন্দ্র করেন পিতার তৈরি হরফের সৌকর্য বৃদ্ধি। শৈশবে প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর অনুমান করা যায় ১৮২০-২২ সালে পিতার সঙ্গে হরফ শিল্পে কাজে যোগ দেন এবং পিতার কাছ থেকে শিল্পটি সম্পর্কে প্রাথমিক পাঠ নিতে শুরু করেন। মাতামহ ও পিতার সৃজনী প্রতিভা যেমন তাঁর মধ্যে ছিল, তেমনি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন তাঁদের দক্ষতা, কর্মকুশলতা ও উদ্যম।

কৃষ্ণচন্দ্রের খোদাই করা ও ছাপা ছবি

শৈল্পিক নৈপুণ্যে তিনি পিতা ও মাতামহকে ছাড়িয়ে যান।

কৃষ্ণচন্দ্র যখন হরফ শিল্পে যোগ দেন তখন নতুন হরফ তৈরি করার অধ্যায় প্রায় শেষ হয়েছে এবং শুরু হয়েছে পুরানো হরফের নতুন রূপদানের। ১৮০০-১৮৩২ সালের মধ্যে প্রধানতঃ মনোহরের নেতৃত্বে শ্রীরামপুর ফাউন্ড্রীতে যে সব হরফ প্রস্তুত হয় তার একটি তালিকা এখানে প্রদত্ত হল। [১]

তালিকা

হরফ ফাউন্ট	ভাষা
আর্মেনিয়ান	আর্মেনিয়ান
বাংলা	বাংলা, আসামী, খাসী, মণিপুরী
বর্মী	বর্মী
চাইনীজ	চীনা
গুজরাটি	গুজরাটি
গুরুমুখী	পাঞ্জাবী
জাভানীজ	জাভানীজ
কইথি	হিন্দী
দেবনাগরী	আওয়াধি, ভূগেলী, ভাটনারী, বিকানিরি, ব্রজ ভাষা, ডোগরী, গাড়োয়ালী, গুজরাটি হারোতি, হিন্দী, জয়পুরী, কনৌজী কোংকনী, কুমায়ুনী, মালভী, মারাঠি, মারয়ারি, মেবারী, নেপালী, পালপা ও সংস্কৃত।
ইন্ডিকা	কালাহান্ডা
মালডিভিয়া*	—
মোদি	মারাঠি
নাক্সী	আরবি, মালুয, সুস্তু, ফার্সী, সিন্ধী।
নাস্তালিক	বালুচী, উর্দু
ওড়িয়া	ওড়িয়া
সারদা	কাশ্মীরি
সিংহলী	সিংহলী
তামিল	তামিল
তেলুগু	তেলুগু
তিব্বতী	ভূটানী

* ফাউন্ট পরিকল্পনা হয়েছিল, কিন্তু তৈরি হয় নি।

তালিকায় দেখা যায় ২১টি বিভিন্ন প্রকৃতির ফাউন্ট তৈরির পরিকল্পনা হয়েছিল এবং ২০টি ফাউন্ট তৈরি হয়। এর মধ্যে পঞ্চানন বাংলা ও দেবনাগরীর ফাউন্ট প্রস্তুত করেন এবং ওড়িয়া ও মোদী (মারাঠি) ফাউন্টের কাজ শুরু করেন। বাকি ১৬টি ফাউন্ট তৈরীর কৃতিত্ব মনোহর ও তাঁর সহকর্মীবৃন্দের। বাইরের সাহায্য এবং প্রথাগত প্রশিক্ষণ ছাড়াই মনোহর এই ফাউন্টগুলি এতো সুন্দরভাবে করেন যে উন্নত দেশগুলির কাছে তা হয় পরম বিস্ময়ের ব্যাপার। যে কোন দেশ পঞ্চানন মনোহরের কৃতিত্বের জন্য গর্বের সঙ্গে স্বীকৃত দিত। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী শিক্ষা অনভিজাত মিস্ত্রীদের (যন্ত্রবিদ) সৃজনী প্রতিভার স্বীকৃতিদানে অনাগ্রহী। সব চেয়ে জটিল চীনা ভাষার সচল ধাতু হরফের আবিষ্কর্তার সম্মান থেকেও প্রতিভাশালী প্রযুক্তি বিজ্ঞানী মনোহরকে বঞ্চিত করেছে। কোন সুসভ্য দেশে এরূপ উদাহরণ পাওয়া যায় না।

শুধু নতুন হরফ তৈরিই নয় মনোহর ক্রম পর্যায়ে পূর্ব প্রস্তুত হরফের আকারের পরিবর্তন (যে কৌশলটি তিনি লসনের কাছে শেখেন), সৌকর্য বৃদ্ধি এবং গুণগত মান বৃদ্ধি করেন। সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চাননের আদর্শ অনুযায়ী সহকর্মীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে যান। মনোহরের শিষ্যদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন তাঁর পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র। গভীর অভিনিবেশে তিনি শেখেন পিতার শিল্প নৈপুণ্য এবং গড়ে ওঠে তার শিল্প জীবন।

১৮১৮ থেকে ১৮৩০ সালের মধ্যে শ্রীরামপুর মিশনের বহুমুখী ও বহু বিস্তৃত কর্মধারা গৌরবের শীর্ষে আরোহণ করে। শ্রীরামপুর মিশনের হরফ শিল্পেও তখন আশাতিরিক্ত উন্নতি লাভ করে। কিন্তু হঠাৎ সব শেষ হয়ে যায়। ওয়ার্ড ও ফেলিক্সের অকাল মৃত্যু (১৮২২-১৮২৩), শ্রীরামপুর মিশনের সঙ্গে লন্ডন বি এম এস এর বিরোধ চরম হলে উভয়ের ছাড়াছাড়ি (১৮২৭), ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ থেকে কেরীর অবসর গ্রহণ (১৮৩০) এবং ১৮৩১-৩২ কলকাতার এজেন্সি হাউসের দেউলিয়া হওয়া শ্রীরামপুর মিশনের বুনিয়াদ একেবারে বিপর্যস্ত করে। সর্বক্ষেত্রে মিশনের কর্মধারা হয়ে যায় সঙ্কুচিত। ১৮৩২ সালে মিশন বোডিং স্কুল, প্রেস ও হরফ নির্মাণ কেন্দ্র এবং কাগজের কলের দয়িত্ব ত্যাগ করে। জন ক্লার্ক মার্শম্যান ব্যক্তিগত ভাবে এগুলির ভার গ্রহণ করেন এবং বোডিং স্কুল, প্রেস ও কাগজের কলের কাজকে অব্যাহত রাখলেও তিনি হরফ নির্মাণ কেন্দ্র তুলে দেন। মনোহর মিশনের কাজ ছেড়ে দিয়ে স্বাধীনভাবে ব্যবসা শুরু করেন এবং ফাউন্ড্রী ও কামারশালা

গড়েন তাঁর নিজের বাড়িতে। তবে মার্শম্যানের জন্য হরফ তিনি নিয়মিতভাবে তৈরি করে দিতেন। কলকাতা এবং ভারতের অনেক প্রেস মনোহরের কাছ থেকে হরফ সংগ্রহ করত। পিতার সহকারী হিসাবে কৃষ্ণচন্দ্র নিজেদের শিল্প কেন্দ্রে মন দিয়ে কাজ করতে থাকেন। আরও কিছুদিন পরে কেরী ও জসুয়া মার্শম্যানের মৃত্যুর পর ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে চন্দ্রোদয় নামে মনোহর একটি প্রেস প্রতিষ্ঠা করেন। প্রেস সংক্রান্ত কাজে তাঁর দীর্ঘকালের অভীজ্ঞতা ও প্রযুক্তি বিদ্যায় অসাধারণ দক্ষতা প্রেসটিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে অনেক সাহায্য করে। তাছাড়া ইতিমধ্যে মুদ্রণ সম্পর্কে অনেক জ্ঞান অর্জন করেন। ফলে চন্দ্রোদয় প্রেস অল্পদিনের মধ্যে বিশেষ জনপ্রিয় হয়। মার্শম্যানের প্রেস এবং কলকাতার প্রতিষ্ঠিত প্রেসগুলির মত নিয়মিতভাবে বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় বিভিন্ন ধরণের বই ছাপা হতে থাকে। সে সময়ের বহুল প্রচারিত "নতুন পঞ্জিকা" চন্দ্রোদয় প্রেস থেকে প্রচারিত হত।[২]

কৃষ্ণচন্দ্র ছাড়া মনোহরের আরও চার ছেলে ছিল। তাঁদের নাম যদুনাথ, রামচন্দ্র, শিবচন্দ্র, ও হরচন্দ্র। এঁরা বংশগত পেশা কামারশালার কাজে যোগ দিলেও হরফ শিল্পে ও প্রেসের কাজে কৃষ্ণচন্দ্র ছাড়া আর কেউই উৎসাহ দেখান নি। কৃষ্ণচন্দ্র মনোহরকে হরফ শিল্প, প্রেসের কাজ ও পঞ্জিকা প্রকাশের কাজে সবকিছুতেই সাহায্য করতেন। চন্দ্রোদয় প্রেসের গৌরব যখন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে ঠিক সেই সময় হঠাৎ ১৮৪৬ সালে মনোহর পৃথিবী থেকে বিদায় নেন।[৩]

দীর্ঘকাল ভারতে হরফ শিল্পে নেতৃত্ব দিয়ে নিঃশব্দে চলে গেলেন প্রতিভাশালী এই মণীষী। পাশ্চাত্য প্রযুক্তি বিজ্ঞান যখন দ্রুত উন্নতির পথে, পাশ্চাত্য জগত প্রযুক্তি বিজ্ঞানীদের গর্বে গর্বিত তখন অনাদৃত অবহেলিত এই সৃজনী প্রতিভা সারা জগতকে চমকে দেয় তাঁর বিষয়ক সৃষ্টির মাধ্যমে। বাংলা তথা ভারত গর্ব করে বলতে পারে প্রয়োজনীয় সুযোগ থাকলে বাঙালি সৃজনী প্রতিভার অবদান কম গৌরবের নয়। খুবই বেদনাদায়ক যে আজকের তরুণ বিজ্ঞানীদের সামনে অনুপ্রেরণাদায়ক এই সব প্রতিভার আদর্শকে তুলে ধরা হয় না।

কৃষ্ণচন্দ্র যোগ্য পিতার যোগ্য সন্তান হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। শ্রীরামপুর মিশনের হরফশিল্প কেন্দ্রে পিতার সহকারি হিসাবে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। মনোহরের সব গৌরবময় সৃষ্টির সঙ্গে তিনি ঘনিষ্টভাবে যুক্ত ছিলেন। মাতামহ ও পিতার নানা হরফ তাঁর হাতে

মার্জিত হয়ে সুদৃশ্য ও সুন্দর রূপ পায় এবং কলকাতার সব প্রেসই মনোহর ও কৃষ্ণচন্দ্রে টাইপ ব্যবহার করে। ভারতের অন্যান্য স্থানের চাহিদাও তাঁরা মেটাতেন। মিশন প্রেসের কার্যভার থেকে অবসর নিয়ে মনোহর যখন নিজে প্রেসও ফাউন্ড্রী করেন তখন কৃষ্ণচন্দ্রও নিজেদের প্রেস ও ফাউন্ড্রীর কাজে আত্মনিয়োগ করেন। মনোহর নতুন পঞ্জিকা প্রকাশ করলে কৃষ্ণচন্দ্র পিতাকে এ কাজেও সহায়তা করেন। কৃষ্ণচন্দ্রের অন্যান্য ভ্রাতারা প্রেস বা হরফ শিল্পের কাজে কোন আগ্রহ দেখান নি। তাঁরা বংশগত বৃত্তি কামারশালার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। কৃষ্ণচন্দ্র শুধু হরফ শিল্পের কাজ নয়, তিনি মুদ্রণ, চিত্রাঙ্কন, ব্লক নির্মাণ প্রভৃতি কাজেও বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তাঁর শিল্প প্রতিভা ছিল অনন্য সাধারণ এবং ধাতু অলঙ্করণের কাজে ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁর হাতে সব কাজই সুন্দর হয়ে উঠত।

১৮৪৬-৪৭ সালে মনোহর পরলোক গমন করেন।[৪] বাংলার এই প্রতিভাশালী যন্ত্রবিদের মৃত্যু হরফ ও মুদ্রণ শিল্পে যে অপূরণীয় ক্ষতি করে সে সম্পর্কে বাংলার সুধী সমাজ ছিলেন নীরব। বিভিন্ন পত্র পত্রিকাতেও মৃত্যু সংবাদ পাওয়া যায় নি, শুধু মিশনারীদের পত্রিকা সত্যপ্রদীপ পঞ্চানন মনোহর ও কৃষ্ণচন্দ্র সম্বন্ধে দীর্ঘ সংবাদ পরিবেশন করে। এই সংবাদ থেকে সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়। এদের সম্বন্ধে শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম প্রকাশে মিশনারীরা কোন কার্পণ্য করেন নি। বিদেশি মিশনারীরা সম্মান দান করলেও দেশীয় সুধী সমাজে তা গৃহীত হয় নি। সত্যপ্রদীপে প্রকাশিত সংবাদটিতে মনোহর সম্পর্কে ছিল, "তাঁহার (পঞ্চাননের) মরণান্তর জামাতা মনোহর মিস্ত্রী তাঁহার পদে নিযুক্ত হইয়া শ্বশুরের তুল্য বিজ্ঞ ও গুণবান প্রযুক্ত ন্যূনাধিক পঞ্চদশ ভাষার অক্ষর (১৫টি বিভিন্ন ফাউন্ট) ক্ষোদন করিয়াছিলেন তন্মধ্যে সুকঠিন চত্বারিংশৎ সহস্র অক্ষর ঘটিত চীনাভাষার অক্ষর কাষ্ঠ ধাতুর ক্ষোদন করেন। এই সময় মনোহর মিস্ত্রী আপনার পুত্র কৃষ্ণচন্দ্রকে উপযুক্ত পাত্র দেখিয়া তাঁহাকে স্বীয় কর্ম্মশিক্ষা করাইয়াছিলেন এবং ১২৪৫ সালে শ্রীরামপুরে যন্ত্রালয় স্থাপন করিয়া বৎসর ২ পঞ্জিকাও নানা বাংলা ইংরেজি পুস্তক মুদ্রিত করিতেন। তিনি ১২৫৩ সালে (ইং ১৮৪৬) লোকান্তরিত হন।[৫]

মনোহরের কর্মধারার ভাব গ্রহণ করেন পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র। শিল্প ও যন্ত্রবিদ্যার জ্ঞান ও কৌশল কৃষ্ণচন্দ্র নিষ্ঠার সঙ্গে পিতার কাছ থেকে গ্রহণ করেন এবং পিতার সঙ্গে দীর্ঘকাল কাজ করে অভীজ্ঞতাও অর্জন

করেন। হরফশিল্পের সঙ্গে চন্দ্রোদয় প্রেসের দায়িত্ব গ্রহণ করে কৃষ্ণচন্দ্র প্রথমে নতুন পঞ্জিকার সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেন। কৃষ্ণচন্দ্রের হাতে পঞ্জিকাটি আরও সুন্দর হয়ে ওঠে। তাছাড়া তিনি প্রেস থেকে ইংরেজি বাংলা, হিন্দী প্রভৃতি ভাষায় বই প্রকাশের ধারাকেও অব্যাহত রাখেন। ছবি ছাপায় চন্দ্রোদয় প্রেস বিশেষ সুনাম অর্জন করে এবং এই প্রেস থেকে প্রকাশিত সচিত্র গ্রন্থাদি সে সময় খুব জনপ্রিয় হয়।

পিতার প্রতিষ্ঠিত প্রেসের পুরানো যন্ত্রটি দিয়ে কাজ চালাতে কৃষ্ণচন্দ্র খুব অসুবিধায় পড়েন। যন্ত্রটিতে তাড়াতাড়ি কাজ করা যেত না এবং ছাপাও ভালো হত না। যন্ত্রটি পাল্টানো প্রয়োজন হয়। কৃষ্ণচন্দ্র নতুন যন্ত্র কেনার জায়গায় নতুন যন্ত্র তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেন। এরূপ দুঃসাহসিক প্রয়াস তাঁর আগে কোন দেশীয় মিস্ত্রী করেন নি। কর্মকার পরিবারের সন্তান হয়ে অপরের তৈরি যন্ত্র ব্যবহার করতে তাঁর আত্মসম্মানে বাধে। মাতামহ ও পিতার সৃজনী প্রতিভার কথা স্মরণ করে তিনি শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের মুদ্রাযন্ত্রের অনুরূপ একটি মুদ্রাযন্ত্র নিজেই তৈরি করেন।[৬] যন্ত্রটিই বোধ হয় দেশীয় শিল্পীর হাতে গড়া ভারতে প্রথম যন্ত্র। সমসাময়িক কালে ভারতে এই বিরল ঘটনাটির প্রতি দেশীয় শিল্পপতি ও ধনী সম্প্রদায়ের নজর পড়ে নি। দেশীয় সৃজনী প্রতিভাকে কাজে লাগাতে কেউই এগিয়ে আসেন নি। নবচেতনায় জাগ্রত বাঙালি প্রতিভা তখন সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুপ্রসারিত। ব্যবসা বাণিজ্য, শিল্প প্রভৃতিতে বাঙালির দৃঢ় পদক্ষেপ সমাজজীবনে তখন নতুন আলোর সন্ধান দিতে শুরু করেছে। এই সময় বাঙালির গঠনমূলক সৃজনী প্রতিভা যদি ধনী শিল্পপতিদের পৃষ্ঠপোষকতা পেত তবে অনেক আগেই বাংলার শিল্পবিপ্লব সমাজের সামগ্রিকরূপ পরিবর্তন করে দিত। কিন্তু উনিশ শতকের গোড়ার দিকে বাঙালি সৃজনী প্রতিভাকে সার্থকভাবে কাজে লাগাবার যে দৃষ্টান্ত শ্রীরামপুরের মিশনারীরা স্থাপন করেন তাকে অনুসরণ করতে কেউই এগিয়ে আসেন নি।

নতুন যন্ত্র নিয়ে কৃষ্ণচন্দ্রের ছাপাখানা নব পর্যায়ে যাত্রা শুরু করে। কম খরচে সুদৃশ্য ছাপার কাজ করার প্রতি লক্ষ্য রেখে চন্দ্রোদয় প্রেসের অগ্রগতি থাকে অব্যাহত। প্রেসের কাজ বাড়লে কৃষ্ণচন্দ্র নিজের হাতে আরও দুটি প্রেস তৈরি করেন। ভারতে ছাপার ইতিহাসে শ্রীরামপুরের ঐতিহ্য ও গৌরব বাড়িয়ে তোলে এই প্রেস। হরকরা, ফ্রেন্ড অফ

ইন্ডিয়া নিয়মিত ভাবে চন্দ্রোদয় প্রেসে ছাপা বই এর খবর প্রকাশ করে। যেমন, হরকরার একটি সংবাদ উল্লেখ করে ফ্রেন্ড অফ ইন্ডিয়া লেখে, "হরকরা লিখেছে হিন্দু কলেজের জনৈক প্রাক্তন ছাত্র ইংরেজি কবিতার একটি বই প্রকাশ করছেন, বইটি গভর্নর জেনারেলকে উৎসর্গ করা হবে। তাছাড়া সংকলন করছেন একটি বাংলা নাটক। শ্রীরামপুরের কৃষ্ণচন্দ্রের প্রেস থেকে প্রকাশিতব্য।" (৩রা সেপ্টেম্বর, ১৮৪৬)'[৬]

হরফ ও ছাপার মেশিন তৈরির সঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্র সুন্দর অলংকরণ ও সুদৃশ্য চিত্র সংযোজন করেন। তাঁর নতুন পঞ্জিকাটির আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট ছিল যে এতে থাকত অনেকগুলি পূর্ণ পৃষ্ঠার সুদৃশ্য চিত্র; তাছাড়া ছোট ছবিও থাকত আরও অনেক। বহু চিত্র শোভিত পঞ্জিকার প্রচলন হয় কৃষ্ণচন্দ্রে নতুন পঞ্জিকার অনুসরণে। চিত্রগুলি সাধারণতঃ হিন্দুদের আরাধ্য দেবদেবীর। ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানাদি যেমন রাসযাত্রা, চড়ক, দোল, রথযাত্রা প্রভৃতি এবং অন্যান্য অনুষ্ঠান সম্পর্কিত। প্রতিটি চিত্রের নীচে লেখা থাকত 'শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কর্মকার কৃত'।[৭]

কৃষ্ণচন্দ্র সর্বোপরি ছিলেন একজন প্রতিভাধর শিল্পী। অলংকরণ শিল্পে তাঁর মাতামহের পূর্বপুরুষদের যে সুনাম ও খ্যাতি ছিল তারই ধারাকে কৃতিত্বের সঙ্গে ধরে রাখেন। গ্রাফিক আর্ট বা চারুকলা প্রবর্তনে এদেশে তিনি ছিলেন একজন পুরোধা, যদিও আধুনিক কালে এই আর্টের বিকাশের ইতিহাসে তার স্বীকৃতি পাওয়া যায় না। গ্রাফিক চিত্রকলার মূল পদ্ধতি এনগ্রেভিংএ তিনি একজন সুনিপুণ শিল্পী ছিলেন। ১৮৪৬ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় ফ্রেন্ড অফ ইন্ডিয়া কৃষ্ণচন্দ্র সম্বন্ধে লেখে, "(বাংলার) সবচেয়ে জনপ্রিয় পঞ্জিকা এই শহর (শ্রীরামপুর) থেকে বাহির হয়। প্রকাশ করেন আমাদের প্রতিভাশালী পাঞ্চ কাটার। তিনি নিজের হাতে পাঞ্চ কাটেন, হরফ ঢালাই করেন, লৌহ নির্মিত মুদ্রণ যন্ত্রটি নিজের হাতে তৈরি করেছেন এবং পঞ্জিকাটির শোভা বৃদ্ধির জন্য দেব-দেবীর নানা মূর্তির চিত্র নিজের মনে আঁকেন, ব্লক তৈরি করেন ও ছাপেন। পঞ্জিকাটির প্রতি কপির মূল্য আট আনা, বছরে চার হাজার কপি পঞ্জিকা বিক্রী হয়। ফেরিওয়ালারা কিছু পঞ্জিকা বিক্রী করে, তারা প্রতি কপিতে এক আনা কমিশন পায়।" কৃষ্ণচন্দ্রে নতুন পঞ্জিকা সম্বন্ধে চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "মুদ্রণ সৌষ্ঠব ও চিত্র সম্পদের দিক থেকে এই পঞ্জিকা এক নতুন যুগের সৃষ্টি করে।"[৮]

কৃষ্ণচন্দ্রের পঞ্জিকার বহুল প্রচার ও বিপুল জনপ্রিয়তা অনেককে

পঞ্জিকা প্রকাশে উদ্বুদ্ধ করে। অনেকে নতুন পঞ্জিকার অবিকল নকল করার চেষ্টা করেন। কৃষ্ণচন্দ্রের অনেক গ্রাহক এতে বিভ্রান্ত হয়। নকলকারীদের মধ্যে অন্যতম প্রধান হল ইংরেজ প্রকাশক সেন্ডরস এন্ড কোং। ছাপা ও ছবির ক্ষেত্রে এই কোম্পানি কৃষ্ণচন্দ্রের অবিকল নকল করে এবং বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে জানায় উন্নত মানের পঞ্জিকা প্রকাশের জন্য তারা বিলেত থেকে ব্লক, বর্ডার ও কাগজ আনাবার চেষ্টা করেন এবং ঐগুলি এসে না পৌঁছানর জন্য অনুকরণ করে পঞ্জিকা ছাপায়। বিজ্ঞাপনটি ছিল নিম্নরূপ ঃ

"এই বিজ্ঞাপন দ্বারা সাধারণ লোকদিগের জ্ঞাপন করা যাইতেছে যে আমরা এই পঞ্জিকার অনুষ্ঠানকালিন কি কি কহিয়াছিলাম যে শ্রীরামপুর পঞ্জিকাপেক্ষা অতি মনোহর রূপে মুদ্রিত করিব। ইহা মনস্থ করিয়া ছবি, বর্ডার অর্থাৎ পৃষ্ঠার চতুষ্পার্শের ফুল ও আর ২ দ্রব্যের নিমিত্ত বিলাতে পত্র লিখিয়াছিলাম। কিন্তু ঐ সকল দ্রব্য বিলাত হইতে আসিবার অনেক বিলম্ব দেখিয়া বর্তমান বৎসর এতদেশিয় ছবি সকল গ্রহণ করিলাম। সম্প্রতি বিলাত হইতে ঐ সকল দ্রব্য এবং বিলাতি কাগজ আসিয়াছে তাহা আগামী বৎসরের পঞ্জিকায় মুদ্রিত করা যাইবেক।"[৯]

সে সময় ইংরেজি নকলের সূত্রপাত। দেশীয় সমাজে গর্বের বিষয় যে সে সময় ইংরেজ কোম্পানি দেশীয় কাজের অবিকল নকল করার কথা প্রচার করছে, এ ঘটনা বিস্ময়কর ও বিরল হলেও দেশীয় সমাজের ওপর কোন ছাপ ফেলে নি। দেশীয় সমাজ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রতিভার সম্মান বা স্বীকৃতি জানাতে এগিয়ে আসেনি।

যদিও এই সময় কলকাতা থেকে বহু বলিষ্ঠ দেশীয় পত্রপত্রিকার আবির্ভাব বাংলার নবজাগরণের কথা সকলকে জানাতে অগ্রণী, তবু ১৮৫০ সালের ১৮ মে মাত্র তেতাল্লিশ বছরে প্রতিভাশালী শিল্পী কৃষ্ণচন্দ্র যখন ইহলোক ত্যাগ করেন তখন মিশনারীদের পত্রিকা ফ্রেন্ড অফ্ ইন্ডিয়া ও সত্যপ্রদীপ ছাড়া আর কেউই এই বিরল প্রতিভার মৃত্যুর সংবাদ প্রকাশ করতে এগিয়ে আসেনি। কলেরায় আক্রান্ত হয়ে হঠাৎ তিনি মারা যান এবং তাঁর বৃদ্ধা মা এবং স্ত্রী তখন জীবিত। তাঁর কোন সন্তান ছিল না। তাঁর ভাই হরচন্দ্র ও রামচন্দ্র চন্দ্রোদয় প্রেস চালাবার ভার গ্রহণ করেন। কিন্তু প্রেসের গৌরব রবি তখন অস্তমিত, তাই ধীরে ধীরে প্রেসটি অবলুপ্তির পথে এগিয়ে যায়।[১০] ২৫ মে, ১৮৫০-এর

সংখ্যায় সাপ্তাহিক 'সপ্তপ্রদীপ' তাঁর মৃত্যুর সংবাদ জানিয়ে লেখে, "পিতা (মনোহর) এবং মাতামহ (পঞ্চানন) অপেক্ষা কৃষ্ণচন্দ্র শিল্প কর্মেতে অতি পটু। সীসার উপর অক্ষর খোদনে যেমন পাকা তেমনও কাষ্ঠে, প্রতিবিম্ব ও স্বর্ণ রৌপ্যাদির অতি সুক্ষ্ম কর্মঘটিত অলংকার নির্মাণ করিতে পারিতেন। পঞ্জিকায় প্রকাশিত সকল প্রতিবিম্ব তাহার স্বহস্তে খোদিত হয়।"[১১] ২৩ মে ১৮৫০ এর সংখ্যায় ফ্রেন্ড অফ ইন্ডিয়া প্রথম পাতায় তাঁর মৃত্যু সংবাদ প্রকাশিত করে এবং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে লেখে,

"Krishna Chandra Kamar (Karmakar).

It is frequently asserted by those who have observed only the surface of the native character that the inhabitants of India, and particularly those of Bengal, are deficient in that hard working and pushing energy which distinguishes them form the Anglosaxon and that they never raise themselves to eminence except by money transactions. We have now, however, to record the death of one who exhibited in his own labours a complete refutations of all these assertions and who, though moving in the humble sphere of a blacksmith, was as worthy of admiration as any of the man who have in England raised themselves to independence solely by their own exertions. The father of Krishna Chandra, Monahar Kamar (Karmakar), entered into the services of the Serampore Missionaries as a manufacturer of steel dies from which the matrix is formed for casting types, or in the parlance of the trade, as a punch cutter. In this capacity he worked on the Serampore establishment for more than thirty years, cut the punches in more than fifteen original characters. The son continued in his father's employment and (Manohar) cut among other difficult types, the intricate Chinese character required by Dr. Marshman for his Chinese works which have puzzled some of the best type founders in Britain. Krishna Chandra subsequently determined to set up for himself as printer, but he was aware of the inefficiency of the old wooden presses and was without sufficient capital to purchase a new

one. With energy and patience deserving of the highest condemnation, he constructed with his own hands, an iron press on the model of those employed in the Serampore Printing office. With this single press, he commenced his business and his low rate of charge and singular skill in the trade, speedily procured him as much business as he could conveniently manage. He gradually purchased or constructed another press or two and commenced the publication of punjika or Bengali Almanack by far the most popular of the many editions current in Bengal and the annual circulation of which rose shortly to 4 or 5 thousands. Although this gave him greater command of money, still he continued his trade of punch cutting and the great improvement which have been made in the appearance of the Bengali types, now used in the twenty presses of Calcutta, is almost entirely to be ascribed to his exertions. His labours, though they never afforded him wealth, gave his an income much superior to that enjoyed by his countrymen in his own rank, and we believe that his sudden death has not left his family unprovided. An attack of Cholera which seived him on the evening of the 18th, carried him off in a few hours and we have rarely witnessed more regret for the death of an individual than that displayed by the native community of Serampore by whom he was universally respected. His life and success should be a stimulous to his countrymen in the path of active, patient exertions and his history, if fully narrated, sould go far to redeem them from the charge of being deficient either in energy of perseverence.''(12)

এই বিস্তৃত বিবরণে ফ্রেন্ড অফ ইন্ডিয়ার সম্পাদক কিছু জায়গায় মনোহর ও কৃষ্ণচন্দ্রের মধ্যে গুলিয়ে ফেলেছেন। কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যুর পর প্রেসের দায়িত্ব নেন তাঁর ভাই-এরা। শ্রী পান্থ লিখেছেন এঁদের বংশধরেরা বেশিদিন এই কাজ চালাতে পারে নি।[১৩] আবার চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন ঃ কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যুর পর চন্দ্রোদয় প্রেসের ঐতিহ্য গঙ্গাধব কর্মকার প্রমুখ ব্যক্তিরা অনেক বৎসর যাবৎ অব্যাহত রেখেছিল।[১৪] তবে উনিশ শতকের শেষের দিকে এই প্রেসের গৌরব অস্তমিত হয়।

উল্লেখপঞ্জী

১। Shaw Graham : Pamphlet on Serampore Printing 1979
২। শ্রী পান্থ : যখন ছাপাখানা এলো পৃঃ ১৭
৩। বন্দ্যোপাধ্যায় : সংবাদপত্রে সেকালেনর কথা ২য় খণ্ড পৃঃ ৭৪২
৪। শ্রী পান্থ : যখন ছাপাখানা এলো পৃঃ ১৭
৫। সত্যপ্রদীপ: ১২৪৫ সাল; ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংবাদপত্রে সেকালের কাতয় উল্লিখিত, পৃঃ ৭২৮
৬। ঐ : ঐ ঐ
৭। Marshman J. C. (ed) : Friend of India (wly) 3rd Sept. 1846
৮। " " : Friend of India (wly) 12th Feb. 1846
৯। বন্দ্যোপাধ্যায় চিত্তরঞ্জন : বঙ্গপ্রসঙ্গ, পৃঃ ৪৬
১০। " " : " "
১১। .. : „ ঐ ঐ
১২। Marshman J. C. : Friend of India (wly) May 23, 1850
১৩। শ্রী পান্থ : যখন ছাপাখানা এলো পৃঃ ৭২
১৪। বন্দ্যোপাধ্যায় চিত্তরঞ্জন : বঙ্গপ্রসঙ্গ পৃঃ ৪৬

১০

বাংলার নবজাগরণের উন্মেষে মুদ্রণ ও হরফ শিল্পের ভূমিকা

আঠারো শতকের শেষার্ধে ইংরেজ কোম্পানি যখন বংলার ভাগ্য নিয়ন্ত্রার পদে অধিষ্ঠিত হয় তখন রাজনৈতিক ভাগ্য বিপর্যয়, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, ষড়যন্ত্র প্রভৃতির উদ্ভুত বিশৃঙ্খলা ও অরাজগতা বাংলার সমাজ জীবনকে সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত করে। অত্যাচার ও শোষণে বাংলার সৃজনী প্রতিভার হয় বিপুল বিনাস। বাংলার মানুষ ইংরেজের অত্যাচারী রূপ দেখে ধারণা করে সম্পদ লুণ্ঠন করা ছাড়া ইংরেজরা বোধ হয় আর কিছু জানে না এবং মনে করে ইংরেজ যা কিছু করে তা দেশের লোকের ও সমাজের ক্ষতি করার জন্য। তাই ১৭৭৭-৭৮ সালে যখন এদেশে ছাপার কাজ সুরু হয়। তখন দেশীয় সমাজ এ থেকে যতদূর সম্ভব দূরে থাকার চেষ্টা করে। দেশীয় লোক মনে করে এর পেছনে ইংরেজদের নিশচয়ই কোন মন্দ উদ্দেশ্য আছে। অহংকারি ইংরেজ সিভিলিয়ানরাও দেশীয় মানুষকে বিশেষ হেয় করতেন বলে দেশীয়দের নিয়ে কাজ চালিয়ে নিলেও ছাপার কাজের বিষয়ে এদের উৎসাহিত করে নি। ফলে শ্রীরামপুরে মিশন প্রেস সক্রিয় হবার আগে বাংলার জন জীবনে মুদ্রণ কোন ছাপ ফেলতে পারেনি। কোম্পানি প্রেসের হরফ ঢালাইখানায় কাজ করার জন্য পঞ্চানন কলকাতা আসেন। তিনি বোধ হয় সিভিলিয়ানদের কাছ থেকে কোন সম্মান ও সমাদর পাননি এবং তাঁর সুযোগ সুবিধা হয়ত ছিল খুব সীমিত। হরফ শিল্পের কোন উন্নতি সে সময় তিনি করতে পারেন নি। আঠারো শতকের শেষ দুই দশকে উন্নয়নশীল

কলকাতা মুদ্রণ ও হরফ শিল্পের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে যে ভূমিকা গ্রহণ করতে পারত উনিশ শতকের প্রথম দুই দশকে শ্রীরামপুরকে সেই দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়।

উনিশ শতকের সুরুতেই বাংলার সাধারণ মানুষের সঙ্গে ছাপার হরফের পরিচয় করিয়ে শ্রীরামপুর মিশন বাংলার সাংস্কৃতিক জীবন বোধকে মধ্যযুগীয় পরিবেশ থেকে আধুনিক জীবনের রাজপথে আনয়ন করে। জনজীবনে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন আনার সব চেয়ে উপযোগী ও শক্তিশালী হাতিয়ার হয় মুদ্রণ শিল্প এবং এই শিল্পের সার্থক রূপায়নে বাঙালি প্রতিভার ভূমিকা অনুল্লেখযোগ্য নয়। হরফ শিল্পের সূচনা, সংগঠন ও বিকাশ বাঙালি প্রযুক্তিবিদ পঞ্চানন, মনোহর, কৃষ্ণচন্দ্র প্রভৃতির সাহায্যেই সম্ভব হয়।

শুধু বাইবেল ছাপার জন্য প্রেস বসিয়ে ছাপার কাজ চালাবার জন্য মিশনারীরা উদ্যোগী হন নি। তাঁরা ছাপার সঙ্গে যুক্ত সব উপাদান তৈরি করে স্বয়ং সম্পূর্ণ মুদ্রণ শিল্প গড়ে তোলেন এবং মুদ্রণকে করেন বাংলার নবজাগরণের প্রধান হাতিয়ার। এঁরা বিদেশি যন্ত্রপাতি এবং দেশিয় যন্ত্রবিদ ও শ্রমজীবিদের সাহায্যে অনুকরণযোগ্য সুবৃহৎ শিল্প গড়া যে সম্ভব তার সার্থক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। মিশনারীরা যে পথ দেখান সে পথ অনুসৃত হয়নি বলে মুদ্রণশিল্প বাংলার ঐতিহ্যমণ্ডিত শিল্প রূপ গড়ে ওঠেনি, আর পঞ্চানন মনোহর কৃষ্ণচন্দ্র প্রভৃতির মত প্রতিভাশালী প্রযুক্তিবিদদের পরিচয় পাওয়া যায় নি।

মুদ্রণকে দেশীয় সমাজে জনপ্রিয় করার জন্য প্রয়োজনীয় ছিল—(১) শিল্পকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা অর্থাৎ মুদ্রণের প্রয়োজনীয় যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ তৈরি করা এবং হরফ, কাগজ, কালী প্রভৃতি প্রস্তুত করা। (২) ছাপার সৌন্দর্য স্পষ্টতা, পঠনোপযোগিতা প্রভৃতি করা। (৩) ছাপার খরচ কমিয়ে ছাপা বইকে সুলভ করা (৪) ছাপা সম্বন্ধে আগ্রহী করার জন্য বিশেষ প্রচার করা (৫) শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি প্রসারের কাজে ছাপাকে কাজে লাগানো ইত্যাদি। শ্রীরামপুর মিশনের আগে কেউই ছাপাকে জনপ্রিয় করার জন্য উদ্যোগী হয় নি। মিশন শুধু ধনী অভিজাতদের মধ্যেই নয়, কৃষি ও শ্রমজীবি সমেত সর্ব স্তরের মানুষের কাছে ছাপাকে আদরণীয় করার প্রয়াসী হয়। কিন্তু তাঁরা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেন বিশেষ করে

খৃস্ট ধর্মের প্রচার পুস্তিকা যা তাদের কাছে গ্রহণীয় হয় নি। ফলে তাঁদের প্রয়াস আশানুরূপ সফল হয়নি। বাংলার গ্রামাঞ্চলে পুঁথির প্রচলনকে কমাতে ছাপা বই এর অনেক সময় লাগে।

প্রাথমিক পর্যায়ে মুদ্রণ সরকারি কাজে, বিদেশি বণিকদের কাজে এবং মিশনারীদের ধর্ম প্রচারের কাজে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সিবিলিয়ান ছাত্রদের জন্য বাংলা ও অন্যান্য ভাষার যে সব বই প্রকাশিত হয় সেগুলি দেশীয় সমাজেও সুপ্রচলিত হয়। নিম্নলিখিত বইগুলির ১৮৩০-এর মধ্যে একাধিক সংস্করণ থেকে বোঝা যায় তাদের প্রচার বিদেশিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না।

কথোপকথন (৩/৪টি সং), হিতোপদেশ (৪/৫টি সং), লিপিমালা (৩টি সং) রামায়ণ (৩টি সং), পত্রধারা। (৩টি সং) বাংলা গ্রামার (৪টি সং) প্রভৃতি বইগুলির সংস্করণ থেকে বোঝা যায় ১৮০১-১৮৩৪ এর মধ্যে বইগুলি দেশীয় ও বিদেশি সমাজে বিশেষ জনপ্রিয় হয়। হরফের ও মুদ্রণের উন্নতি বউগুলিকে বিশেষ আকর্ষণীয় করে তোলে। উনিশ শতকের তৃতীয় দশক থেকেই শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উন্নয়নের জোয়ার আনে ছাপা বই। খৃষ্টধর্ম প্রচার পুস্তিকা ছাপার প্রতি দেশীয় সমাজে যে অনাগ্রহ সৃষ্টি করেছিল, ধীরে ধীরে তা দূর হয় এবং গ্রন্থ, সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্র প্রকাশ ও মুদ্রণ শিল্পে দেশীয় শিল্পপতি ও সুধী সমাজ এগিয়ে আসেন। কিন্তু হরফ শিল্পের মাধ্যমে বাঙালি প্রতিভা স্ফুরণের সুযোগ দেবার উদ্যম খুব বেশি দেখা যায় না। তাই পঞ্চানন কর্মকার পরিবারের ঐতিহ্য ব্যাপকভাবে বিস্তৃতি লাভ করে নি।

তবে বাংলা মুদ্রণ ও হরফ শিল্পের প্রভাব সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে এবং বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানে এই শিল্প দ্রুত হারে বিস্তার লাভ করে। উনিশ শতকের প্রথমার্ধের মধ্যেই সারা ভারতে মুদ্রণ হয় নবজাগরণের শক্তিশালী হাতিয়ার। কলকাতায় ছাপাখানা হয় সবচেয়ে জনপ্রিয়। উনিশ শতকের প্রথম প্রহরে কলকাতার পাড়ায় পাড়ায় ছাপা খানা আর ছাপাখানা। পারস্পরিক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ছাপার উন্নতি, সচিত্র অলংকরণ, সচ্ছতা প্রভৃতি বিকাশ দ্রুততালে হলেও হরফের উন্নতির দায়িত্ব প্রধানাংশে শ্রীরামপুরের কর্মকার পরিবারকে বহন করতে হয়। শ্রীরামপুর মিশন দেখিয়ে দেয় দেশিয় প্রতিভার সাহায্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ সুউন্নত মুদ্রণ শিল্প প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। শ্রীরামপুর মিশনের এই দৃষ্টান্ত সে সময় অনুসৃত হলে বাংলায় পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুদ্রণ শিল্প

কেন্দ্র স্থায়ীভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হত এবং সেযুগের বাংলার বিজ্ঞান প্রতিভা যে অগৌরবের নয় তাও প্রমানিত হত।

মনোহর, কৃষ্ণচন্দ্র প্রমুখ কৃতবিদ্য প্রযুক্তিবিদ বিজ্ঞানীরা সমাজে যে উপেক্ষা ও অনাদর পেয়েছেন তা তাঁদের উত্তর সাধকদের অনুপ্রেরিত করেনি এবং তাঁদের প্রতিভার ঔজ্জ্বল্য সঞ্চারিত হয় নি পরবর্তী পর্যায়ে।

পঞ্চাননের হরফ শিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আত্মীয় পরিজন সহ অনেককেই হরফ শিল্পে শিক্ষা দেয়। তাঁর বড় ভাই গদাধরের পুত্র অধর চন্দ্র বংশের ঐতিহ্যের ধারাকে সজীব রাখেন। তিনি অধর টাইপ ফাউন্ড্রী নামে একটি হরফ শিল্প কেন্দ্র স্থাপন করেন। পঞ্চাননের মৃত্যুর পরে ১৮০৯ খ্রীস্টাব্দে এই ফাউন্ড্রী প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ফাউন্ড্রীর মাধ্যমে কর্মকার পরিবারের ঐতিহ্যমণ্ডিত শিল্পটি আধুনিকাল পর্যন্ত পরিচালিত হয়। ড. সবিতা চট্টোপাধ্যায়, ড. ইন্দিরা দাস, শ্রী পান্থ প্রমুখ গবেষকরা এই শিল্প সম্বন্ধে কিছু তথ্য সংগ্রহ করেন। শ্রী পান্থ লিখেছেন, 'অধর টাইপ ফাউন্ড্রীটি আমরাও দেখছি। বেশকিছুকাল বন্ধ থাকার পর সম্প্রতি আবার সেটি চালু করার চেষ্টা চলছে। ওঁদের কাছে এখনও রয়েছে আদ্যিকালের হরফ ঢালাই এর নানা সাজ সরঞ্জাম। কাগজপত্রে সর্বত্র বলা হয়েছে ফাউন্ড্রীটি স্থাপিত হয় ১৮০৯ সনে। তার আগেই পঞ্চাননের মৃত্যু। সুতরাং এটি পঞ্চাননের প্রতিষ্ঠিত এমন বলা যায় না। দ্বিতীয়তঃ অধর চন্দ্র পঞ্চাননের সমসাময়িক নন, মধ্যে অন্ততঃ একপুরুষের ব্যবধান। এই বংশ আসলে পঞ্চাননের ভাই গদাধরের বংশ। তবে প্রতিষ্ঠাতা যিনিই হোক না কেন, অধর ফাউন্ড্রী অবশ্যই এরাজ্যে অন্যতম প্রাচীন হরফ তৈরির কারখানা। এই কারখানার খ্যাতি এক সময় আশেপাশের রাজ্যগুলিতেও ছড়িয়ে পড়েছিল।

দেড় শতাধিক বছর ধরে অধর চন্দ্রের উত্তরসূরীরা কৃতিত্বের সঙ্গে ফাউন্ড্রী পরিচালনা করেন, যদিও এই কৃতিত্বের জন্য তাঁদের ভাগ্যে সমাদর বা জাতীয় সম্মান কিছুই জোটেনি। কোন উন্নত দেশে এরূপ ঘটনা বিরল। প্রতিভা ও দক্ষতাকে যথোচিত মর্যাদা জানাতে কোন দেশই কার্পণ্য করেন না। পরিবেশ ও পরিস্থিতির চাপে অধর চন্দ্রের বর্তমান বংশ ধরেরা হরফ শিল্পের কাজেকে চালু না রাখতে পারলেও, বংশের গৌরবকে স্মরণীয় করে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন কিন্তু স্থানীয় জনসাধারণ এবং দেশের সুধিসমাজ বিস্ময়কর ভাবে বিষয়টি সম্পর্কে নীরব।

মনোহর কৃষ্ণচন্দ্রে বংশধরদের মধ্যে হরফ শিল্প সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহ দেখা যায় না। তাঁরা বংশগত পেশা কামারের কাজছাড়া বেশ কিছু দিন চন্দ্রোদয় প্রেস ও পঞ্জিকা প্রকাশের কাজ চালিয়ে যান। প্রেস ও পঞ্জিকা শেষ পর্যন্ত এঁরা বাঁচাতে পারেন না। জিরাট, ত্রিবেণী, বংশবাটী, চন্দননগর, শ্রীরামপুর প্রভৃতি স্থানে অনুসন্ধান করেও এই পরিবার সম্পর্কে কোন নতুন তথ্য সংগ্রহ করা যায় নি।

আজ আমরা মুদ্রণোত্তর যুগের সামনে উপস্থিতি। দৃষ্টি শ্রুতি সহায়ক আধুনিক যন্ত্রাদি শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক জীবনকে নব পর্যায়ে উত্তরণ করতে চলেছে। যান্ত্রিক অনুলিপির সাহায্য মুদ্রণের প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রকে সীমিত করেছে। আধুনিক পঠন, লিখন শ্রবণের সহায়করা নতুন মাত্রা যোগ করেছে আমাদের সমাজ জীবনে। দুশো বছর আগে মুদ্রণটি একই রূপ মাত্রা যোগ করেছিল। মধ্যযুগীয় জীবন বোধ তখন আধুনিকতার রাজপথে উপস্থিত হয়। আজকের উপলব্ধি দিয়ে বুঝতে পারি ছাপাবই তখন মানুষের কাছে কত আদরণীয় ছিল, আধুনিক সমাজ সচেতন দেশ গঠনে ছাপাখানার ভূমিকা ছিল কত গুরুত্ব পূর্ণ। বাংলার নবজাগরণ উন্মেষের অন্যতম প্রধান রূপকার ছাপা বই। এই ছাপা বইকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব যাঁরা নিয়েছিলেন তাঁদের প্রত্যেকেই দেশ ও জাতির কাছে সমভাবে বরনীয় ও স্মরণীয়। তাই বোল্ট্স্, হিকি, হ্যালহেড, উইলকিন্স, কেরী, ওয়ার্ড প্রমুখ বিদেশি মনীষীদের সঙ্গে একই ভাবে স্মরণ করা উচিত পঞ্চানন, মনোহর, কৃষ্ণচন্দ্র এবং অজ্ঞাত আরও অনেক দেশীয় মনীষীদের কথা।

উল্লেখপঞ্জী

১। শ্রী পন্থা : যখন ছাপাখানা এলো পৃঃ ৪৬

২। দাস ইন্দিরা : আনন্দবাজার পত্রিকা (চিছিপত্র) ১৬ জুলাই, ১৯৭৭

৩। চট্টোপাধ্যায় সবিতা : বাংলা সাহিত্যে ইউরোপীয় লেখক পৃঃ ৩৬-৪৩

৪। Das Indira : Origin and growth of Serampore (unpublished Thesis)

৫। শ্রী পান্থ : যখন ছাপাখানা এলো পৃঃ ৭৩

পরিশিষ্ট

(ক) হরফ শিল্পগুরু পঞ্চানন কর্মকারের বংশাবলী *

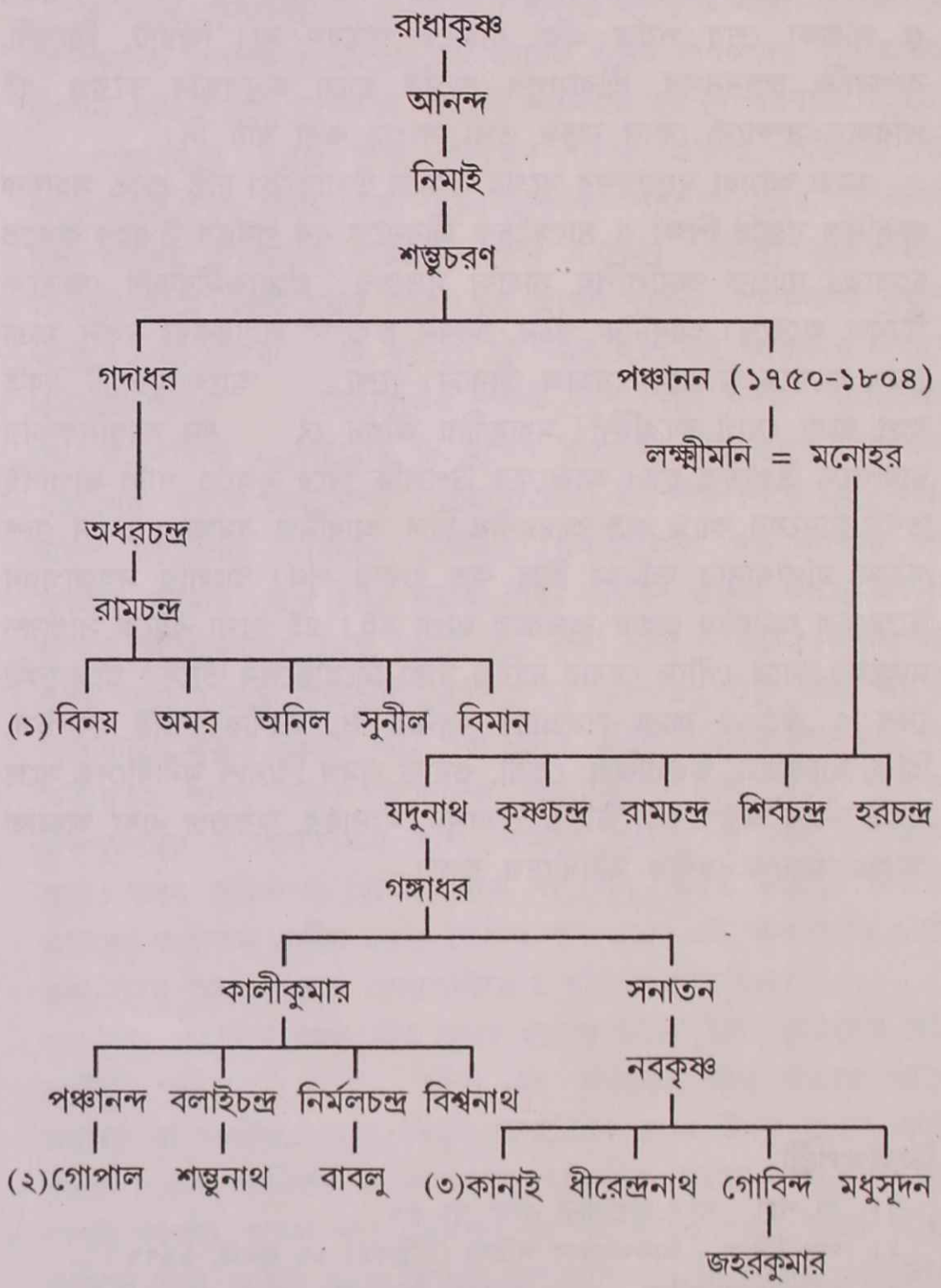

(১) *(শ্রীরামপুর বটতলার নিকট জি.টি. রোডের ধারে কোম্পানী বাগানে এঁদের বাড়ি। এখানে দীর্ঘ দিন অধর টাইপ ফাউন্ড্রী প্রতিষ্ঠিত ছিল)*

(২) *(বংশাবলীটি তৈরি হয়েছে বিমান মল্লিক কর্তৃক প্রচারিত পত্র এবং ড. ইন্দিরা দাসের সহায়তায় মনোহরের বংশধরদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের সাহায্যে)*

(৩) *(৩২/৩৩ ঋষি বঙ্কিম সরণী, শ্রীরামপুরে এঁদের নিবাস। মনোহরের চন্দ্রোদয় প্রেস এখানে ছিল)*

খ

পঞ্চানন, মনোহর ও কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী

*		হুগলী জেলার জিরাটে নবাব আলীবর্দির প্রশংসাধন্য কর্মকার পরিবারে পঞ্চাননের জন্ম।
* ১৭৭৮	:	বাংলায় মুদ্রিত প্রথম বই হ্যালহেডের গ্রামারের জন্য প্রথম ধাতুর হরফ খোদাই করেন।
* ১৭৭৯-১৮০০	:	কলিকাতায় কোম্পানি প্রেসের হরফ ঢালাইখানায় কাজ করেন।
* ১ মে, ১৮০০	:	শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের কাজে যোগদান করেন।
* ১৮০০-১৮০৪	:	বাংলা, নাগরী, ওড়িয়া, মারাঠি প্রভৃতি ভাষার হরফ নির্মাণের কাজ শুরু করেন। হরফ শিল্প-শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেন এবং মনোহর প্রমুখ অনেককে এই শিল্পে শিক্ষা দেন। ১৮০৪ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

* ১৮০৪-১৮৩২ : পঞ্চাননের প্রধান শিষ্য ও জামাতা মনোহর হরফ শিল্প কেন্দ্রের দায়িত্ব নেন এবং আর্মেনীয়, বাংলা, বর্মী, চীনা, গুজরাটি, গুরুমুখী, জাভানীজ, কইথী, নাগরী, ইন্ডিকা, মোদী, নাক্সী, নাস্তালিক, ওড়িয়া, সারদা, সিংহলী, তামিল, তেলেগু, থাই ও তিব্বতী ভাষার হরফ নির্মাণে সফল হন। চীনা সমেত অনেকগুলি ভাষার হরফ এখানেই প্রথম নির্মিত হয়। হরফের আকার হ্রাস ও সৌষ্ঠব বৃদ্ধিতে মনোহর বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে সফল হন। মনোহরের দ্বিতীয় পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র পিতার মত সুদক্ষ হয়ে ওঠেন ও হরফ নির্মাণে তাঁকে বিশেষ সাহায্য করেন।

* ১৮৩৮ : মনোহর চন্দ্রোদয় প্রেস স্থাপন করেন এবং নতুন পঞ্জিকা প্রকাশ করেন।

* ১৮৪৬ : মনোহরের মৃত্যু হয়। কৃষ্ণচন্দ্র চন্দ্রোদয় প্রেসের ভার গ্রহণ করে নিজ হাতে তিনটি প্রেস নির্মাণ করেন। অলঙ্করণের শিল্পী হিসাবেও খ্যাতিলাভ করেন।

* ১৮৫০, ১৫ই মে : নিঃসন্তান কৃষ্ণচন্দ্র পরলোকগমন করেন।

গ

পঞ্চাননের পিতৃভূমি প্রসঙ্গে

'বাংলা সাহিত্যে ইউরোপীয় লেখক' গ্রন্থে ডাঃ সবিতা চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, "পঞ্চানন কর্মকারের পূর্বপুরুষদের আদি নিবাস হুগলী জেলার জিরাট-বলাগড় গ্রামে। জিরাটে এখন যেখানে আশুতোষ স্মৃতি মন্দির, তাহারই নিকটস্থ চারাবাগানে ইহাদের আদি বাস্তুভিটা ছিল বলিয়া পঞ্চাননের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বংশধরেরা নির্দেশ দিতেছেন।" এই বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য জিরাট বলাগড়ে যাই এবং এখানে আশুতোষ স্মৃতি মন্দিরের কাছে চারাবাগানের অনুসন্ধান করি। কিন্তু বর্তমানে তার কোন অস্তিত্ব নেই এবং স্থানীয় লোকদের জিজ্ঞাসাবাদ করে কিছুই জানতে পারিনি। গ্রামের কয়েকজন প্রাচীন ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করি, কিন্তু তাঁরাও পঞ্চাননের বাস্তুভিটা সম্বন্ধে কিছু বলতে পারেন না। শ্রদ্ধেয় মনীষী আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুত্র উমাতোষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করি। তিনি বলেন, এ সম্পর্কে তাঁর কিছু জানা নেই। পঞ্চানন কর্মকারের জ্যেষ্ঠভ্রাতার বংশধরেরা শ্রীরামপুরে বাস করেন। তাঁদের কাছে অনুসন্ধান করলে তাঁরা বলেন জিরাট বলাগড়ের সঙ্গে তাঁদের কোন যোগাযোগ নেই। তাঁরাও জানেন না যে পঞ্চাননের আদি বাসভূমি জিরাট বলাগড়ে ছিল। জিরাটে বসবাসকারী একটি কর্মকার পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করেও কিছু জানতে পারিনি। চন্দননগরের ফরাসি ভাষাবিদ পণ্ডিত ডঃ কালী চরণ কর্মকারের শরণাপন্ন হই। তিনি কয়েকটি ঠিকানা দেন। তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ

করেও কিছু জানা যায় নি। অবশেষে জিরাটের আহমদপুর গ্রাম নিবাসী সুশীলকুমার বিশ্বাস মহাশয় অত্যন্ত সহৃদয়তার সঙ্গে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। তাঁর সাহায্যে জিরাটের কাছে কালিয়াগড়ের মহাকাল ভৈরব ও সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরের সেবায়েত বংশের উমাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করি। উমাপ্রসন্নবাবুর পিতা স্বর্গীয় কামাখ্যা পদ চট্টোপাধ্যায় ভারত সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন এবং মহাকাল ভৈরব ও সিদ্ধেশ্বরীর মন্দিরের সংস্কারের জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। পিতার কাছ থেকে উমাবাবু মহাকাল ভৈরবের ইতিহাস যেমন জানতে পারেন তেমনি জানতে পারেন আর একটি বিশেষ চমকপ্রদ ঘটনা। তিনি জানেন যে সিদ্ধেশ্বরীর মন্দির সংলগ্ন বিরাট যে বাগানটি আছে আগে তাকে চারাবাগান বলা হত। গঙ্গা তখন মন্দিরের তলদেশ আর চারাবাগানের পাশ দিয়ে বইত। এখন গঙ্গা মন্দির থেকে অনেকখানি পূর্ব দিকে সরে গেছে। গঙ্গার ঘাটের প্রাচীন সিঁড়ির ভগ্নাংশ এখনও মন্দিরের পাশে দেখা যায়। চারাবাগানে সে সময় কর্মকার, কুম্ভকার প্রভৃতি হস্তশিল্পীদের বাস ছিল। জলপথই সে সময় যোগাযোগ ও যাতায়াতের সুবিধাজনক পথ ছিল বলে, গঙ্গার দু'ধারে ছিল শিল্পাঞ্চল ও ঘন বসতিপূর্ণ। এখানকার ধাতু, মাটি প্রভৃতির শিল্পজাত জিনিষ বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে সরবরাহ হত। আঠারো শতকের প্রথম দিকে পর্তুগীজ বণিকরা ব্যাণ্ডেলে, হুগলীতে তাদের ঘাঁটি গাড়ে আর গঙ্গার তীরবর্তি নিরীহ অধিবাসীরা পর্তুগীজ জলদস্যুদের অত্যাচারে ভীষণভাবে উত্যক্ত হয়। গঙ্গায় প্রতিদিনই জলদস্যুরা লুটপাট করত। একদিন রাত্রে পর্তুগীজ জলদস্যুরা একজন ব্রাহ্মণকন্যাকে লুট করে নিয়ে পালাচ্ছিল। মেয়েটি "বাঁচাও বাঁচাও" বলে আর্তস্বরে চীৎকার করতে থাকে, বিশেষ করে চারাবাগানের অধিবাসীদের কাছে আবেদন জানায়। কিন্তু দস্যুদের ভয়ে সবাই চুপ করে থাকে, কেউই এগিয়ে যায় না। বাঁচার কোন উপায় দেখতে না পেয়ে মেয়েটি অভিশাপ দিয়ে বলে, "বিপন্ন কন্যাকে বাঁচাতে যারা এগিয়ে এলো না তারা সবাই নির্বংশ হবে", এই বলে মেয়েটি সেই বন্দী অবস্থা থেকে জোর করে নিজেকে ছাড়িয়ে গঙ্গায় ঝাঁপ দেয়। এই অভিশাপে চারাবাগানের লোকেরা খুব ভয় পেয়ে যায়। সত্যসত্যই কিছুদিন পরে ওখানে মড়ক লাগে এবং অনেক লোক

মরতে থাকে। বাকিরা প্রাণভয়ে ঐ স্থান ত্যাগ করে চলে যায়। শ্রী চট্টোপাধ্যায়ের ধারণা চারাবাগান ছেড়ে এই সময় যাঁরা চলে যান তাঁদের দলে পঞ্চাননের পরিবারও ছিল। মনে হয়, পঞ্চাননের ঠাকুর'দা ও বাবা এই সময় চারাবাগান ছেড়ে স-পরিবারে ত্রিবেণীতে আসেন এবং সেখানে কামারশালা গড়ে কাজ শুরু করেন। কিন্তু সেখানে তাঁর পরিবারের বাসস্থান খুঁজে পাই নি। খুব সম্ভব, পঞ্চানন ১৭৭৯তে কলকাতায় গেলে পরিবারকে নিয়ে যান নি, মাঝে মাঝে বাড়িতে আসতেন। ১৮০০ সালে শ্রীরামপুরে আসার পর তিনি শুধু নিজের পরিবারই নয়, আত্মীয়স্বজন অনেককেই শ্রীরামপুরে নিয়ে আসেন।

ঘ

মনোহর কর্মকারের বংশধর

১৯৯৩ সালে শ্রীরামপুর ৩৩ নং বঙ্কিম সরণী নিবাসী গোবিন্দলাল দাস মহাশয়ের কাছ থেকে জানা যায় যে তাঁর পূর্বপুরুষ গঙ্গাধর কর্মকার চন্দ্রোদয় প্রেসের মালিক ছিলেন এবং ছাপার ও টাইপ তৈরির কাজে যুক্ত ছিলেন। তাঁর পুত্র সনাতন কর্মকারও প্রেসটি চালান। কিন্তু নাতি নবকৃষ্ণ কর্মকার আর প্রেস চালাতে পারেন না। তিনি টাইপ তৈরি ও প্রেসের কাজ বন্ধ করে দেন। নবকৃষ্ণের পুত্রেরা কর্মকার পদবী পরিবর্তন করে দাস পদবী গ্রহণ করেন। বক্তা গোবিন্দলাল তাঁর তৃতীয় পুত্র। ১৯৯৩ সালে ওঁর বয়স আনুমানিক ৭০ বছর। তিনি বলেন যে তিনি শুনেছেন চন্দ্রোদয় প্রেস থেকে নতুন পঞ্জিকা প্রণয়নের জন্য ভাটপাড়ার পণ্ডিতেরা তাঁদের বাড়িতে আসতেন এবং তাঁরা স্বপাকে অন্নগ্রহণ করে তালপাতার পুঁথিতে পঞ্জিকার গণনার ফল লিপিবদ্ধ করতেন। ঐগুলি পরে তুলোট কাগজে অনুলিখিত হয়ে ছাপা হত। চন্দ্রোদয় প্রেসটি ভারতীয় যাদুঘরে দেওয়া হয়। উহাতে উড়ন্ত চিলের একটি প্রতিকৃতি আছে। অনুমান করা হয় প্রেসটি মনোহরের তৈরি এবং গঙ্গাধর তাঁর বংশধর। মনোহরের পাঁচপুত্রের মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্র প্রেস ও টাইপ নির্মাণ কেন্দ্রের ভার নেন। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন এবং তাঁর মৃত্যুর পর দুই ভ্রাতা রামচন্দ্র ও হরচন্দ্র প্রেসের ভার নেন। গঙ্গাধর এঁদের কারুর সন্তান। গঙ্গাধরের দুই পুত্রের বংশধরেরা পদবী পরিবর্তন করে দাস হয়েছেন। প্রেস ও হরফশিল্পের সঙ্গে তাঁদের কোন যোগাযোগ নেই। এঁদের বাড়ির কিছু অংশ সংস্কার হয়নি, দেখলেই বোঝা যায় দুই শত বছরের পুরানো। তবে ভবিষ্যতে হয়ত প্রাচীনের চিহ্ন আর থাকবে না।

ধর্ম্ম পুস্তক

তাহা ঈশ্বরের সমস্ত বাক্য।—

যাহা প্রকাশ করিয়াছেন মনুষ্যের ত্রাণ ও

কার্য্য শোধনার্থে—

তাহার প্রথম ভাগ যাহাতে চারি বর্গ—

মোশার ব্যবস্থা।—
য়িশয়ালের বিবরন।—
গীতাদি।—
ভবিষ্যত বাক্য।—

মোশার ব্যবস্থা—

তর্জ্জমা হইল এব্রি ভাষা হইতে।—

—কেরী

শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।—

১৮০১।—